

পঞ্চম অধ্যায়

## মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজভাবনা-দ্বন্দ্বিকময় জীবনচিত্র ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প

“রাত্রি নিহত করো। সূর্যের সুতীক্ষ্ণ তীর হেনে

শেষ করো আঁধারের আয়ু। চন্দ্র আর তারার প্রার্থনা

পূর্ণ করো। পূর্ণ করো স্বাতীর বাসনা।

...প্রাণের বিদুৎ-বহি দিয়ে গড়ে এক দধীচি আয়ুধ-

বৃত্রাসুর-রাত্রির কালিমা তবে তো উজ্জ্বল নীল হ'বে।

স্বাতী তার বারি বিন্দু নিয়ে তবে তো উজ্জ্বল মণি হ'বে।

তারকারা সেই কামনায় তাইতো উজ্জ্বল দীপ হলো!!”

অসংখ্য মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস সৃষ্ট ‘১৯৭১’। নবজাতক রূপে বিশ্বের দরবারে আসে ‘বাংলাদেশ’। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে নাম পায় ‘বাংলাদেশ’ হিসেবে। উত্তাল বিশ্বের ভুবনে ১৯৭১ সালের একটু পরিক্রমা করে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবিতে প্রবল গণআন্দোলন জেগে উঠেছিল। ২৫ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের ওপর ফ্যাসিস্ট আক্রমণ শুরু করে। ২৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান থেকে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ নব জীবন লাভ করে। কসোভিয়ার সামরিক বিদ্রোহ চলতে থাকে, এতে রাষ্ট্র প্রধান প্রিন্স নরোত্তম গদীচ্যুত হন। এ্যাঙ্গোলার প্রেসিডেন্ট কবি ড. অ্যান্টিন হে নেতার ভারতে আগমন ঘটে। বিদ্রোহী জননেতা ক্রুশ্চেভ পরলোকের বাসিন্দা হন। পাবলো নেরুদা পান বৃহৎ সম্মান নোবেল। ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় এবং বাংলাদেশী সেনাবাহিনীর কাছে পাক সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণ দেখা যায়। হিসেবে জানা যায় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ নিহত এবং ২৮০ জন বুদ্ধিজীবী খুন হয়। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধছিল অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র সম্মুখ সমর। বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অগুনতি নিরাশ্রয় মানুষের স্থানান্তর ঘটে। ১-১৩ মার্চ ভারতে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন সংঘটিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভার

নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়। এখানে যুক্ত মন্ত্রীসভা ৩ মাস স্থায়িত্ব পেয়েছিল। এরপর রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়। এতে করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়া মরুভূমির উষ্ণতা পায়। নকশালবাড়ি আন্দোলনের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। জোতদারদের হত্যা এবং পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে রাইফেল ছিনতাই কাজ অব্যাহত থাকে। অসংখ্য কিশোর-তরুণরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। দেওয়ালে দেওয়ালে শ্লোগান দেখা যায় ‘চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান’, ‘সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করণ’ প্রভৃতি। শিক্ষাব্যবস্থার গতানুগতিকতার বিরুদ্ধেও সাধারণ মানুষের জেহাদ উপস্থাপিত হয়। দেখা যায় গণ টোকাটুকির ব্যাপকতা। নকশালবাড়ি -ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে জোতদার, মহাজন, পুলিশ খতম অভিযানের সংবাদ এবং ঘটনার বিশ্লেষণ প্রকাশ পায় সি.পি.আই (এম.এল)-এর মুখপত্র ‘দেশব্রতী’ পত্রিকায়। কবিদের মধ্যে সরোজ দত্ত ‘শশাঙ্ক’ ছদ্মনামে কলম হাতে তুলে নেয়। ৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দীদের উপর নির্বিচার অত্যাচার চলে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ‘অরণি’ পত্রিকার সম্পাদক কবি এবং গল্পকার তিমিরবরণ সিংহকে বহরমপুর জেলে পুলিশ ওয়ার্ডারের চক্রান্তে খুন করা হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি বহরমপুর জেলে পুনরাবৃত্ত রূপে ৯ বন্দীর হত্যা হয়। ৮ মার্চ পুনায় লাল পতাকা নিয়ে ২৫০ নারীর মিছিল দেখা যায়। ১৯ এপ্রিল কবি নরেন্দ্র দেবের মৃত্যু হয়। ১৩ মে ইনসিওরেন্স পলিসিকে জাতীয় পলিসি রূপে তুলে আনা হয়। ১৪ মে দমদম সেন্ট্রাল জেলে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ১৬ জন বন্দীর মৃত্যু ঘটে। জুন মাসে ‘মিশা’ আইন চালু হয়। ১১ জুলাই আলিপুর স্পেশাল জেলেও ৬ বন্দীর মৃত্যু হয়। ২৫ জুলাই সাহিত্যিক কবি মুরারী চট্টোপাধ্যায়-এর উপর হাজারীবাগ জেলে ঘটে চরম নিষ্ঠুরতা, জেলে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। আবারও পুনরাবৃত্তি ৪ আগস্ট কবি বিপ্লবী সাংবাদিক তথা রাজনীতিবিদ সরোজ দত্তকে পুলিশ বাহিনি মুণ্ডুকেটে নিয়ে জীবনলীলা সাঙ্গ করে। আগস্টেই ‘প্রিভিপার্স’ রাজন্যভাতা বিলোপ করা হয়। ৫ আগস্ট আসানসোলে ৯ বন্দীর হত্যা হয়। ১২-১৪ আগস্ট বরাহনগরে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বিপুল পরিমাণে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। একদিনেই প্রায় ১০০ কিশোর যুবককে উগ্রপন্থী সন্দেহে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে হত্যা করা হয়। নারকীয় এই হত্যায়জ্ঞে খাতাকলমে মৃত্যু সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১২ আগস্ট দক্ষিণের তিন বিপ্লবী জ্বালামুখী কবি, চেরাবাণ্ডা, রাজু ও নিখিলেশ্বরকে পি.ডি. অ্যাক্টের মাধ্যমে আটক করা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া জেলে সংঘর্ষ

বাঁধে। সংঘর্ষের জের ছড়িয়ে পড়ে হাওড়া বাঁটারা অঞ্চলে। অগুণিত সাধারণের উপর পুলিশের তাণ্ডব। পুলিশ কর্তৃপক্ষের জঘন্য কর্মের আরেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় ২৬ নভেম্বর; আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ৮ বন্দী নিহত হয় এবং ২০২ জন বন্দী ভয়ঙ্কর রূপে আহত হয়। আর এক কবি দ্রোণাচার্য ঘোষকে পুলিশ হুগলী জেলে গুলি করে হত্যা করে। সরকার কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রূপে ‘মিজোরামে’র সৃষ্টি করে।

উত্তাল এই মহলে যে সকল সাহিত্যিক তারোকারা নিজস্ব সৃষ্টি কর্মের ঝুলি নিয়ে সমাজে এসেছিলেন তাদের মধ্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। সমাজ বৃত্তাসুরকে উপস্থাপন করে, তার থেকে মুক্তির পথ সন্ধানে ইলিয়াস নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন তাঁর লেখনী যন্ত্রে। বিপুল সম্ভার নিয়ে মানুষকে জাগানোর পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না, এমনকি জীবনের দীর্ঘসূত্রি তাঁর ছিল না বলেই অনধিক কাঠামোতেই পূর্ণতার প্রয়াস দান করার চেষ্টা আমরা তাঁর অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছি বলে মনে হয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। গল্পগুলি লেখা হয় মূলত ’৬৫-’৭৫ সময় পর্বে। এরপর ইলিয়াসের গল্পগুলি মুক্তি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পটভূমিতে লেখা। প্রায় স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের সঙ্গেই তার বেড়ে চলা। একই সঙ্গে তিনি দেখেন ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ’৬৯ -এর গণ অভ্যুত্থান; ’৭১ এর মুক্তি যুদ্ধ পেরিয়ে আজকের বাংলাদেশকে। “ছোটগল্পে আঁটসাঁট বন্ধন স্থান, কাল ও ব্যক্তিকে যথাযথভাবে শিল্পায়িত করতে ইলিয়াস যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন।”<sup>২</sup> কোনো ঘটনা, পরিস্থিতির নিরিখে পরিবর্তিত বাংলাদেশকে তিনি দেখান নি। তিনি দেখিয়েছেন আবহমান কালের নিরিখে পরিবর্তিত বাংলাদেশকে। ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’ -এর মায়মুনদের মত ’৬৯ এরও মিথের শিকার হতে হয় চেংটুদের। ‘ভূতের সাথে যুদ্ধ’ আজও সেখানে অব্যাহত। ‘মার্চের স্বপ্ন’ গুলির মত চোখে অনেক স্বপ্ন ও ‘শহীদ মিনার’, ‘কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু’র মত আবেগ থাকলেও বাংলাদেশ ‘স্বরূপের সন্ধান’ পেতে এখনো ব্যর্থ। কারণ সেখানে ‘মধ্যবিত্ত : ভাসমান, শৌখিন, ক্ষয়িষ্ণু’ সেজন্য অনেক স্বপ্ন দেখা চোখে আজও ‘বাংলাদেশ : পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়’ ইলিয়াস মনে করতেন এই জটিল সময়ে ছোটগল্প আর ছোটকথা বলে না। তাঁর মতে শিল্প কখনও তত্ত্বের ধার ধারে না। তাই অন্তঃদৃষ্টিতে যে সমাজ অসংলগ্নতাকে চিত্রাৰ্পিত করেছে সেখানে তিনি শিল্পী, তাত্ত্বিক কিংবা সমাজ সংস্কারক নয়, সেখানে তিনি তাঁর লেখনী আর্শির মাধ্যমে তুলে ধরেন

প্রকৃত বর্তমান বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের অবস্থানকে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজভাবনা-দ্বন্দ্বিকময় জীবন জটিলতায় মানুষের অবস্থান, এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে। আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিতে আমরা কিছু ভিন্ন শিরোনাম বিভাগ রেখে আলোচনা সমাপ্তির পথে এগোব—

**ক. গল্পে অর্থনৈতিক ভাবনা ও বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ :**

“ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান বীরশ্রেষ্ঠ

কে বলে মরেছ তুমি? মিথ্যে কথা আমরা দু’জন

এখনো তো আছি গলাগলি

আমরা এগিয়ে যাব বসন্ত হয়ে, ফুল ফুটিয়ে

তোমার নতুন উড়াল পোশাক

দেবে এই কবিতা শাল্মলি।।”<sup>৩</sup>

সময় আজ ফ্লাইটে চেপে বিশ্বের নানান প্রান্তে উন্নতির গতি ধারাকে ক্রম বিকশিত করে চলেছে। মতিউর রহমান হারিয়ে গেছে, লেখক আখতারুজ্জামান হারিয়ে গেছে কিন্তু সময়কে তারা বেঁধে দিয়ে গেছে কালো অক্ষরে সাদা পাতায়। মুক্তি যুদ্ধোত্তর আর্থিক ভাবনাকে নব বসন্তের ফুলের ন্যায় আমাদের সামনে ফুটিয়ে গেছেন। নব অর্থনীতি উড়ন্ত পাখির ডানায় উড়াল দিয়ে বঙ্গ অর্থনীতির কোলে এসে প্রকাশ করেছে তার অবস্থাকে। আর্থিক নৌকার গতিপথের পিছনের ইতিহাসে আমরা বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা এখানে জেনে নেব—

বাংলাদেশে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিনিয়োগ নীতি



বাংলাদেশে ফরাসী বাণিজ্য, ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডে ফরাসী



বাংলাদেশে ওলন্দাজ বাণিজ্য



বাংলাদেশে আমেনীয় বণিকের বাণিজ্য



বাংলাদেশে ব্যক্তিগত বাণিজ্য



ভারতীয় মূল বাজার



প্রকাশ্যে মুদ্রা ব্যবস্থা ও অধিকোষ ব্যবস্থা



উৎপাদকদের উৎপাদিত অর্থ ব্যবস্থা



আফিম উৎপাদন ও আফিম উৎপাদক ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা



অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ থেকে সম্পদ নিষ্ক্ৰমণ



ডেনীয় বাণিজ্য



ফারুক শিয়ারের ফরমান নির্ভর বাংলার বাণিজ্য

কোম্পানী, ফরাসী, আর্মেনীয়, ওলন্দাজ, ডেনীয় এবং বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থনীতিয় ব্যবস্থা অতীত ইতিহাসের বিনিময় প্রথা, স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রা যুগের অবসান ঘটিয়ে নতুন অর্থনীতি 'টাকা'য় রূপ লাভ করে। ক্রমে এই টাকার সঙ্গে মানব সমাজের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত বিনয় ঘোষ জানান—

“টাকার যে শুধু চক্রগতি আছে তা নয়, তার অনুভূতি আছে হৃদস্পন্দন আছে। টাকার অনুভূতি এবং মানুষের অনুভূতি একাকার হয়ে মিশে গেল। মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক আর্থিক সম্পর্কে পরিণত হল।”<sup>৪</sup>

নব জাগরণের দিনে সামন্ত অর্থনীতি ভেঙ্গে যায়। বলা চলে 'যুগাবসানে লাগেই তো আগুন। যা ছাই হবার তাই ছাই হয়। যা টিকে থাকে তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।' অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের মনে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত এবং ক্যাথলিক ধর্মের শাসন বাঁধা

প্রদান করে, ফলে সৃষ্টি হয় বুর্জোয়া তথা মধ্যবিত্ত সমাজ। একা একা দাবি পূরণ করতে পারবে না বলে সাহায্য নেয় শিল্প শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষদের কিন্তু দাবি পূরণের নামে চলে প্রহসন। মধ্যবিত্তের দাবি পূরণ হয়, সাধারণ মানুষের ঐকান্তিক দাবির প্রতি আর তাদের কোনো আগ্রহ থাকে না, ফলে তাদের দাবি সমূহ ব্রাত্যই থেকে যায়। কারণ সন্ধানে অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে নজর দিতেই হয়—আঠারো শতকের ইংরেজ মধ্যবিত্ত তাদের সমশ্রেণি ফরাসীদের থেকে অনেক বেশি রক্ষণশীল এবং ধর্মানুরাগী রূপে দেখা দিয়েছিল। শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটানোই তাদের মূল লক্ষ্য মাত্রা ছিল। গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয় কিন্তু অভ্যন্তরে সামন্ত এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে আপোস রক্ষা হয় গণতন্ত্র পড়ে থাকে ভাগাড়ে। সমাজ নতুন শক্তি সঞ্চয় করলেও সামন্ততন্ত্র ও প্রোটেক্ট্যান্ট চার্চের ধ্বংস সাধন হয়। সমাজে ধর্মীয় শাসন লুপ্ত হবার কথা যেখানে সেখানে ধর্মের শাসন ফুলে ফেঁপে বেড়ে ওঠে। ঠিক একই সময়ে ফ্রান্স প্রদেশেও রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধে বুর্জোয়া সমাজের নেতৃত্বে। তবে ইংল্যান্ডের ঘটনার ঠিক উল্টো পথেই ফ্রান্সের আন্দোলন চলে। চার্চের সঙ্গে তাদের প্রবল বিরোধ হয়। ভলতেয়ার ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে যায়। বুর্জোয়া সমাজ শিল্প ব্যবস্থায় বিজ্ঞানকে নিয়ে আসে এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে চার্চকে নানা প্রশ্ন করে। কিন্তু চার্চীয় সমাজ (ধর্ম) সে সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দানে ব্যর্থ মনোরথ। ফলে বিরোধের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। তাই না ১৭৮৯ সালে বুর্জোয়া এবং সাধারণ মানুষের সমন্বয়ে সংঘটিত হয় ফরাসী বিপ্লব। এবং এই আন্দোলনে কোনো প্রকার ধর্মীয় মুখোশের চিহ্ন মাত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় না। সরাসরি তা রাজনৈতিক আন্দোলন হয়ে ওঠে। তাছাড়া তাদের দ্বারাই আন্দোলনও পরিচালিত হয়। মজার বিষয় এখানেও সাধারণ শিল্পাশ্রয়ী এবং কৃষক সাধারণ ব্রাত্যই থেকে যায়। নেপোলিয়নের (১৮০৪-১৮১৪ এবং ১৮১৫ তে ১০০ দিন ক্ষমতায় ছিলেন) নেতৃত্বে বৃহৎ বুর্জোয়া সমাজ ফ্রান্স থেকে বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। অর্থনীতির মূল কাঠামোতে নিম্নবিত্তের স্থান তখনও আসেনি। ১৮৩২ সালে ইংল্যান্ডের অভিজাতেরা পার্লামেন্টের সংস্কার সাধন করলে কিছু সংখ্যক বুর্জোয়ার পার্লামেন্টে প্রবেশের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। বুর্জোয়াদের অধীনে শ্রমিক সমাজও দাবি পেশ করে কিন্তু কিছুই হয় না। এতে ১৮৩২ সালেই শ্রমিকরা নিজস্ব দাবি একত্র করে একটি চার্টার তৈরি করে আন্দোলনে নামে। এই আন্দোলনের নাম হয়েছিল ‘চার্টিস্ট আন্দোলন’ এবং আন্দোলনকারীদের চার্টিস্ট নামে

আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এদেরকেই এঙ্গেলস্ আধুনিক যুগের প্রথম শিল্প শ্রমিকদের দল হিসেবে অভিহিত করেন।<sup>৬</sup> ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্তর্গত বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত মানুষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য ভারতকে বেছে নেয় কিন্তু ভারতে বাণিজ্য করতে হলে ট্যাক্স দিতে হবে বলে তারা ফারুকসিয়ারের আরোগ্য লাভে সাহায্য করে ১৭৬৫ সালে বিনা শুষ্কে বাণিজ্য করার অনুমতি পত্র আদায় করে বাংলা, বিহার, ওড়িশ্যায় ক্রমে নতুন বাজার দখল করে নেয়। সাধারণত আমরা সকলেই জ্ঞাত যে মূল অর্থনীতি বাজারের উপরই নির্ভরশীল। ফলে তারা বাংলার বাজার অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের করায়ত্ত করার চেষ্টা করে। বাংলার বাজার অর্থনীতি ধসে যায়। এদিকে জব চার্গক গোবিন্দপুর, সুতানুটি কলকাতা ক্রয় করে বাণিজ্য নগরী স্থাপন করে বসে। ইংরেজ লর্ড কর্ণওয়ালীস ক্ষমতায় এসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করলে বাংলার ভূমিনির্ভর বাকি অর্থনীতি ইংরেজদের সম্পূর্ণ রূপে দখলে চলে যায়। ১৮০০ সালে ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ স্থাপন এবং ১৮৭২ হিন্দু কলেজ স্থাপনা দ্বারা স্বদেশ এবং এদেশের মানুষদের শিক্ষা দিয়ে তারা নিজেদের কাজে শিক্ষিতদের নিযুক্ত করতে থাকে। বাংলার বুকে গড়ে উঠতে থাকে উমেদারি করা বৃহৎ নব মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া সমাজ। ইংরেজদের সান্নিধ্যে থেকে ক্রমে এই সমাজ আত্মিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী হতে হতে ক্রমশ ‘টিপিকাল’ হয়ে ওঠে। বাংলার অর্থনীতি থেকে এই সময়কালে ইংরেজ সান্নিধ্যে কয়েকজন প্রচুর অর্থবান হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ, ভূকৈলাসের গোকুল ঘোষাল, জয় নারায়ণ ঘোষাল, হাট খোলার মদন দত্ত, সিমলার রামদুলাল দে, গোবিন্দরাম মিত্র প্রমুখরা। মুসলমান মধ্যবিত্ত তখনও নিজস্ব বেড়া জাল কেটে বের হতে পারে নি। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের শুরুতে মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের কলা কৌশলময় উমেদারি বুঝে যায় এবং ক্রমশ তারাও মধ্যবিত্তের মূল স্রোতে উঠে আসে। সময় গড়িয়ে স্বাধীনতা, মুক্তি আন্দোলন এলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল তালিকা শক্তিতে নিম্নবিত্ত তিমিরেই থেকে যায়। তবে হ্যাঁ ১৯৭১ মুক্তি যুদ্ধোত্তর বাঙালি মুঘল মধ্যবিত্ত সমাজ এবং সাধারণ শ্রমিক-কৃষক সমাজের অর্থনীতিতে কিছু পরিবর্তন আসে। বাঙালি মধ্যবিত্ত পাকিস্তানের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু বাংলার সমাজ ভূমিতেও উচ্চবিত্ত বিদ্যমান থাকায় তারাও শোষিত হতে থাকে। এ যেন শুধু ক্ষমতার হাতবদল। তবে বিংশ শতকের অর্থনীতির ভিত্তি মূলে নানান পালাবদল আসে। অর্থাৎ এ

যেন টাকার হাতবদল পালা করে একটু দেখে নেওয়া যাক—

অর্থ



বাংলার কৃষি



বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অবদান



কৃষি অর্থনীতিতে সমস্যা, কৃষক আন্দোলন এবং প্রজাস্বত্ব



সংশোধনী আইন প্রণয়নের পর কৃষি অর্থনীতির অবস্থান



বর্গা ব্যবস্থার উৎপত্তি, বিস্তার ও বর্গাদারদের সংগ্রামের অস্তিত্বে

অর্থনীতির টালমাটাল স্থিতাবস্থা



বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আর্থিক অবনতির সঙ্গে আসে পঞ্চাশের মন্বন্তর



বাংলার শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রগতি



বাণিজ্য বিস্তারে আর্থিক পরিশুদ্ধিকরণ



বিনিময়, ব্যক্তিগত সমবায় দ্বারা অর্থ যোগান



মূল্যস্তর, মজুরি ও বেতন নির্ভর আর্থিক ভাবনা



শিল্প-শ্রমিকদের সমস্যা ও শ্রমিক আন্দোলনের আর্থিক বঞ্চনার

অভিযোগে অর্থনীতির পুনর্ভাবনা



জল ও স্থলপথ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে আর্থিক

ভাবনার উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা

আলোচ্য সকল দিক মাথায় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ প্রাগ্রসরতার পথে পা বাড়ায়। তবে মানবিক মানস গঠনের উপাদান সমূহ পূরণের পথে মূল্যবোধের উন্নতি এবং অবনতির আরোহ এবং অবরোহ পদ্ধতি ক্রমশ টাকার চলমান ধারায় চলতে থাকে। মানবজীবনে আসে জটিলতা। সামাজিক বাঁধন ক্রমে ছিন্নতার প্রাপ্তে পৌঁছে যায়। পারিবারিক সম্পর্কের অভ্যন্তরে টাকা জুয়া খেলা শুরু করে দেয়। ফলে চড়াই উৎরাই অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে বাংলার ভূমিতে ভাগ বসায়—

“মানুষের জীবনের সমস্ত উপকরণ দোষগুণ মানবিক পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক প্রেম ভক্তি স্নেহ ভালবাসা পাপপুণ্য সবই টাকার বিনিময় মূল্যে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। সমাজটাই একটা বড় মার্কেটের মতো এবং মার্কেটে বহুবিধ মনুষ্যের মূল্যতালিকা সর্বদাই তেমনি লটকানো থাকে। জ্ঞানীগুণী মানী প্রেমিক প্রেমিকা গুরু শিষ্য স্বামী-স্ত্রী পুত্রকন্যা ভাই বোন উচ্চশিক্ষিত মধ্যশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত পাণ্ডিত মূর্খ সকলের দাম টাকার বিনিময় হিসেবে সমাজের বাজারে টাঙানো আছে। এ টাকা একালের গতিশীল টাকা, সদাজাগ্রত সতত সঞ্চরণশীল টাকা, সেকালের মন্থরগতি জরদগাব মোহর মুদ্রা নয়। ... নাগরিক মন হয়েছে টাকার মতো ক্যালকুলেটিং, ইটপাথরের মতো কঠিন।”<sup>৬</sup>

চলমান টাকাকে কেন্দ্র করে মুক্তি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থান বিভিন্ন এন.জি.ও. (NGO)গুলির হাতে চলে যায়। ক্রমে তারাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। গ্রামীণ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা জমির অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার ছুটকারা সম্ভব হয় না ফলে তারাও গ্রামীণ অর্থনীতির উপর জাকিয়ে বসে। রাজাকার বাহিনীর প্রতাপ কোনো মতেই অপসৃত হয়নি, বরং তা আরো গৌরবের সহিত মাথাচাড়া দিয়ে সমাজের অর্থনীতিতে

ভাগ বসায়। হিন্দুদের সম্পত্তি ভোগ দখলের জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যায়। স্বাধীনতার স্বাদ জনমানসে প্রকাশ্যে উপভোগ করার জন্য আওয়ামী লীগ সমাজে পরিবর্তন আনার প্রয়াস চালায় ১৯৭২ সালে। পরিবর্তনের ডাক দিয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ এ আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করে। এতে ভেঙ্গে যাওয়া অর্থনীতি পুনর্নির্মানের নানান পদক্ষেপ দেখা যায়। পদক্ষেপগুলি দেখে নেওয়া আমাদের আলোচনায় বিশেষ দাবি রাখে<sup>৭</sup>—

#### শাসনতন্ত্রের মূলনীতি :

জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এই চারটি আদর্শই হইবে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি। ইহাতে আরও বলা হয় যে সাবেক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক চাকুরীর বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, মহকুমাগুলিকে জেলায় পরিণত করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে।

#### অর্থনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচী :

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নতি বিধানে সমাজতন্ত্রের আগাইয়া যাইতে হইবে। আমাদের নিজেদের সম্পদের উপর লক্ষ্য রাখিয়া সম্মুখের দিকে আগাইয়া যাইতে হইবে।

#### আয়কর ব্যবস্থা :

আয়কর ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করা হইবে। সকল বকেয়া কর ও কৃষকদের ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। প্রতিটি ইউনিয়নে সমবায় ভিত্তিতে একটি করিয়া নায্য মূল্যের দোকান স্থাপন করা হইবে যেখান হইতে চাউল, গম, তৈল ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে পাওয়া হইবে।

#### সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ :

বাধ্যতামূলকভাবে আয় সীমিত করণের জন্য নূতন করণীত প্রবর্তন করা হইবে। বিলাস দ্রব্য ও বড় বড় অটালিকা নির্মাণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

#### কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা :

পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও গ্রামীণ কুটির ও কৃষি উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

এখানে আরেকটি বিষয় জানানো বিশেষ প্রয়োজন; মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের

মধ্যবিত্ত অর্থনীতি কিছু মানদণ্ডের উপর দাঁড়িয়েছিল—



মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ এই অর্থনীতির উপর ভর করেই সমাজে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এমনকি আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার নিরলস বুদ্ধিনির্ভর পরিশ্রম চালিয়ে গেছে।

“নড়বড়ে কড়িকাঠ বেয়ে দীর্ঘ যাত্রা তারপর

পিচ্ছিল দেয়াল ধ’রে পা-টিপে পা-টিপে নেমে আসে

এই মাকড়সা এর জাল আছে, কোন গৃহ নেই

খড়-কুটো কুড়িয়ে কুড়িয়ে এনে ক্রমে জড় ক’রে

নিপুন ধৈর্যের সাথে অতি সন্তর্পণে বুনে তোলে

এই যে চড়ুই, এর নীড় নীড় আছে, কোন গৃহ নেই -

বছর বছর ধ’রে অনন্ত মরুর কূল বেয়ে

দুঃখ-কষ্টে ধুলোতে বালুতে জলে গুমরে-গুমরে ফেরে

এই যে বাতাস, এর আশা আছে, কোন প্রেম নেই”<sup>৮</sup>

বাঙালি মুসলমান নড়বড়ে কড়িকাঠে ভর করে গুটি গুটি পা টিপে ক্রমশ এগিয়ে গেছে অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। মাকড়সার জাল বিস্তার করে আত্মরক্ষার্থে শিকার ধরেছে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের অর্থ ও শ্রমের উপর। নিপুন ধৈর্যের সাথে সমাজে সন্তর্পণে গৃহ নির্মাণ করে পারিবারিক জটিলতায় মগ্ন থেকেছে। যা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় পর্বে জটিল কুটিলতর রূপে নিজেদের খোলস শক্ত করেছে। প্রেম বাহ্যিক, অন্তর তাদের মরুর বালির ন্যায় শুকনো; যাবতীয় সুবিধা লাভের আশায় সর্বদা শুষ্ক প্রাণে উন্মুখ হয়ে

মরীচিকা সৃষ্টি করে সমাজ পথিকদের মায়াজালে বিদ্ধ করতে সদাব্যস্ত। এই ব্যস্ত প্রাণ মধ্যবিত্ত বাঙালির অর্থনীতিক ব্যবস্থাকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর গল্পে ঝিনুকের অন্তরালে মুক্তার ন্যায় লালন করে আমাদের সামনে উগ্রে দিয়েছে।

“মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ শক্তির চেহারা বদলায়, কিন্তু তার ওপর শিল্পির মজ্জাগত অনাস্থা একটুও কমে না। এই শক্তির ওপর আস্থা রাখার কোনো কারণও ঘটেনি। সমাজ ব্যবস্থার ঘোরতর শয়তানির ফলে বেশিরভাগ মানুষের উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত থাকে কেবল তাদের শ্রমের মাধ্যমে, এর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অন্য একটা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর হাতে। এই অসঙ্গতি থেকে শ্রেণি ও শ্রেণি মানসিকতার উদ্ভব।”<sup>৯</sup>

— এই উৎপাদন ব্যবস্থার নিরিখেই সমাজ হয় পরিবর্তিত। আর আলোচিত প্রেক্ষিত থেকেই গড়ে ওঠে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো। সমাজকে গভীর সচেতনতার সঙ্গে অবলোকন করার ফলে ইলিয়াসের বিভিন্ন রচনায়, বলা যেতে পারে বেশিরভাগ রচনাতেই এই অর্থনৈতিক ভাবনা উঠে আসে।

‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ (১৯৬৫-১৯৭৫) গল্পগ্রন্থের ‘উৎসব’ গল্প আলোচনার নিরিখে একটি অসাধারণ গল্প। “নিজস্ব অস্তিত্বের প্রশ্নে ব্যক্তির ব্যক্ত হওয়ার প্রবণতার মধ্যেই রয়েছে সম্পর্ক নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অস্তিত্ব সম্পর্ক তৈরি করে না। সম্পর্ক তৈরি করে সত্তা। ব্যক্তির কোনো একটি সত্তা অন্য কোনো ব্যক্তির সম্পর্ক সত্তার সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ রচনা করে পরস্পর স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য। স্বার্থ চরিতার্থ হলে অস্তিত্ব তৃপ্ত হয়। না হলে অতৃপ্তি। তখন সম্পর্ক বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং ক্রমে সম্পর্কচ্ছেদ। ঐ সম্পর্কচ্ছেদ অস্তিত্বের সংকট ডেকে আনতে পারে।”<sup>১০</sup> অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া গল্পের মূল চরিত্র আনোয়ার আলি এই দ্বন্দ্বিকময় অস্তিত্বের সংকটের শিকার হয়।

“বিত্ত বৈভব যদিও সামাজিক যর্মান্দার আসল মানদণ্ড নয়, তবুও আমাদের প্রচলিত সমাজ প্রথায় এর স্বীকৃতি প্রচলিত। এ কারণে বিত্তের উপর হিসেব করে তৈরি করা হয় শ্রেণী প্রথা। কিন্তু মানুষ হিসেবে সবার আসন একই জায়গায়, এ বাস্তব সত্য

উপলব্ধি করানোর প্রয়াসেই ‘উৎসব’ গল্পের ফাঁদ পেতেছেন

ইলিয়াস।”<sup>১১</sup>

শিক্ষা জীবনে আনোয়ার আলি, কাইয়ুম, হাফিজ একসঙ্গে কলেজে পড়তো। বিবর্তিত সময়ের সমাজে ক্রমে একে একে পেশায় নিযুক্ত হয়ে পড়ে। বন্ধু কাইয়ুমের বিয়ের কয়েক বছর পর উৎসবের ন্যায় আসে আনোয়ার আলির জীবনে। বিয়ের উৎসবে আনোয়ার আলি নিজেকে অনেক হীন, দরিদ্র, বঞ্চিত হিসেবে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। ধানমণ্ডির সুসজ্জিত বিবাহ বাড়ির উৎসব মুখর পরিবেশের সঙ্গে সে তার পুরানো ঢাকার পানসে বাড়ি মেলানোর চেষ্টা করে। এতে তার জীবনের আর্থিক দীনতাই প্রকাশ পায়। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে উৎসবে অংশগ্রহণকারী নারীদের মেলানোর চেষ্টা করে; কিন্তু ক্রমশই তার বাস্তব জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এখানে গল্পকার ইলিয়াস শুধু মানুষ নয় অর্থনীতি সমাজের স্থানিক ধানমণ্ডি ও পুরানো ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবন চিত্রকেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি ‘Struggle for Existence’ এর বর্তমান মুক্তিযুদ্ধোত্তর পরিবেশে আনোয়ার, কাইয়ুম, হাফিজ বন্ধুদের আলোচিত সমাজ জীবন ও ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত মানসিক চিন্তা ধারার ক্রমপরিবর্তিত অবস্থাকেও তুলে ধরতে চেয়েছেন আমাদের সামনে। মধ্যবিত্তের উন্নতি এবং পুরানো অবস্থানে টিকে থাকার লড়াইকেও এই গল্প প্রকাশ্যে আনার এক অনবদ্য প্রয়াস।

“আনোয়ার আলির দুঃখের কারণ : এই অঞ্চল এবং উৎসবমুখর বাড়ি ও ঐ এলাকা তার বিরক্ত চিত্তে পাশাপাশি অবস্থান করে। ... নিজের ঘরে ঢুকলে মনে হয়, এই ঘর ঐ গলির একটা বাইলেন। সেই ভিজে ভিজে ভ্যাপসা ভোঁতা গন্ধ, ৪০ পাওয়ারের টকটক আলোর ভেতরে ঘুম থেকে ওঠা মালেহা বেগমের পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা হলুদাভ ও একটা শাদা দাঁত নির্লজ্জ উঁকি দেয়। সালেহা বেগম তাঁর স্ত্রী তার স্ত্রীর ঠোঁটের কোণে লালার আভাস, সমগ্র মুখমণ্ডলে গ্রাম্যতা, কেবল গ্রাম্যতা তোতলায়।”<sup>১২</sup>

ধানমণ্ডির বন্ধু স্ত্রী এবং রূপসী নারীদের দেখার পর অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া আনোয়ার আলির স্ত্রীর, দৈনন্দিন কার্যকলাপ আর পছন্দ হয় না—

“মুনতাসির কি ইশতিয়ার কি আহরার এলে কণিকা  
বন্দ্যোপাধ্যায়ের এল.পি. চালিয়ে দিয়ে সোস্যালিজম  
সম্বন্ধে গল্প করছে কি নরম গলায়। আবার এরই ফাঁকে  
ফাঁকে সময় করে লোনলিনেস কি মিষ্টি কষ্ট পায়। তখন  
আর উপায় থাকে না, পুরো দুটো ঘন্টা এয়ার কন্ডিশনের  
ওপর ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে ডিউক এলিংটন শোনে।  
... সালেহার ঘুম ঘুম হাসি এড়াবার জন্য আনোয়ার আলি  
উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে লুঙি পরতে থাকে। তার  
শ্লেষ হয়, এই মেয়েটা বছর খানেক হলেও তো কলেজে  
পড়েছে, বিয়ের আগে এমনকি একটু প্রেম মতোনও  
করলো। অথচ এমন জবুথুবু হয়ে থাকে কেন? শাড়ির  
ভেতর বুক নেই পাছা নেই, দিনরাত হেঁটে বেড়াচ্ছে  
একটা বেচপ কোলবালিশ।”<sup>১৩</sup>

নিম্ন মধ্যবিত্ত আনোয়ার আলি উৎসব ফেরার রঙিন চশমা চোখে আঁটলেও আর্থিক নিরুপায়  
যৌন লালসা নিবারণে শেষে স্ত্রীর কাছেই উপগত হয়। বাইরের কুকুরের সঙ্গম দৃশ্য দেখে  
এসে সালেহাকে প্রিয় ডাক শেলী বলে ডেকে ‘আনোয়ার আলির হাত থেকে রবারের পুরু ক্লাভস  
খুলে গেছে। চামড়ার আবরণটাও উঠে যাচ্ছে নাকি? ... সুখ ও উত্তেজনায় আনোয়ার আলির উত্তপ্ত কণ্ঠ  
থেকে, মুখ থেকে আঠালো ধ্বনি চুঁয়ে পড়ে।’<sup>১৪</sup> মুক্তি যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া  
বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত জীবন ঠিক যেমনভাবে চলছিল তারই সুন্দর উপস্থাপন ইলিয়াস  
আলোচ্য গল্পে তুলে ধরেছেন। শিক্ষিত পেশাজীবী অল্প অর্থের অধীন মানুষের জীবন, বোধ  
হয় না এর থেকে তৎকালীন সময়ে ভালো ছিল।

“ক্রিটিক সে!

অন্ততঃ তাহাই তার মত,

কেননা তাহার কয় কবি বন্ধুর

কবিতার লিখেছে সে দীর্ঘ আলোচনা!

... অপূর্ব প্রতিভা নিয়ে লিখবেই দীর্ঘ আলোচনা!”<sup>১৫</sup>

ইলিয়াস সাহেব ক্রিটিক তবে সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা দীর্ঘ মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান জীবনের ক্রিটিক। অন্যান্য কথাকার অপেক্ষা ভিন্ন পথে গল্পবয়নে কাপড় ঢাকা দিয়ে সমাজ অর্থনীতির সমালোচনা করেছেন মানব জীবনকে সামনে রেখে। তাঁর সমালোচনা ঠিক নয় আলোচনা মূলক নিপুণ প্রতিভার স্বাক্ষর মূলক গল্পগ্রন্থ ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’। এই গ্রন্থের সমাজ সমস্যামূলক অর্থনীতি উপজীব্য অনন্য সাধারণ গল্প হল ‘প্রতিশোধ’। গল্পের মূল পটে নারীর সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও বৈষয়িক সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে সংঘাত কীভাবে ঘনিয়ে উঠতে পারে এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির লোভ যুগে যুগে কীভাবে প্রবহমানতা পেয়েছে এই পৃথিবীতে তারই সফল স্বরূপ উদ্ঘাটন ঘটেছে আমাদের আলোচ্য গল্পচিত্রে।

শহুরে চাকুরিজীবী ছেলে ওসমান, বাবা গণির অসুস্থতার খবরে গ্রামে আসে। অসুস্থ বাবার সাথে দেখা করা অপেক্ষা তার মাথায় ঘোরে তার চাকুরির কথা ও ছুটিতে নিজের ঘরে বাথরুমে সিমেন্ট দেবার কথা। গল্পসূত্র বুননে আমরা জানতে পারি আবদুল গণির একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে আবুল হাশেম সব ছেড়ে ব্যবসায় নামে। স্ত্রী রোকেয়ার মৃত্যু হয় রহস্যজনক ভাবে। গণি সাহেবের ছেলে ওসমানের ধারণা রোকেয়াকে হত্যা করেছে হাশেমই। ওসমান এসে দেখে বোনের হত্যাকারী ঘাতক স্বামী আবুল হাশেমের শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি বাগিয়ে নেবার প্রচেষ্টা। আবার দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে আবুল হাশেম বিয়ে করেছে নার্গিসকে, যে কিনা ওসমানের প্রেমিকা ছিল। ওসমান হাশেমকে হত্যা করার ফন্দি ফাঁদে। কিন্তু এতে বাদ সাধে ভাই আনিসের একটি টেঙার। যা যোগাড় করে আনতে পারে একমাত্র হাশেম। কারণ বড় কর্তাদের সাথে তার ওঠা বসা আছে। আবদুল গণিরও আনিসের মানসিকতা হাশেমের বিরুদ্ধে পরিবর্তিত হয়। তারা হাশেমকে খাতির এবং তোয়াজ করতে থাকে। আর এদিকে ওসমান হ্যালুসিয়েশনে নিজেই হত্যা করে নিজেকে। কিন্তু বাস্তবে ফিরে এসে ওসমান, হাশেম হত্যার সংকল্প ত্যাগ করে। সকলের বিরুদ্ধে এমনকি অর্থনৈতিক স্বার্থে ওসমান সাবধান হয়ে যায় পরিবারের মূল স্বার্থ রক্ষার্থে।

“ওপরে ছাদ নেই, কোনো ছাদ নেই, কেবল আকাশ। নীল ও  
নির্লিপ্ত আকাশ। অনেক দূরে দূরে চরে বেড়ায় সাদা মেঘের  
পাল। সমস্ত আকাশে কোথাও একবিন্দু রক্ত চিহ্ন নেই।  
শরৎকালের নীলচে শাখা রোদে আকাশের নিচেকার নিরাবরণ

শূন্যতার একেবারে ভিতটাও দ্যাখ্যা যায়। কোথাও রক্ত নেই।  
ওসমানের বাঁ হাত চলে যায় ওর নিজের মাথায়। একেবারে  
শুকনো চুল, হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরলে সেখানে হৃদয়,  
বুদ্ধি, আয়ু, প্রেম প্রভৃতির রেখা প্রখর দুপুরবেলার খরায় খটখট  
করে।

বিচলিত হয়ে ওসমান একটু নিচে দেখলো। খুব ব্যস্ত হাতে  
তাড়াতাড়ি করে সে ছুঁড়ে ফেললো লোহার রডটা। তারপর  
দ্রুত পদক্ষেপে নেমে এলো একেবারে নিচ তলায়। না, না, এসব  
ব্যাপারে সাবধান হওয়া ভালো। কখনো কখনো লোভ সামলানো  
বড় কঠিন। কখন কি বাসনা হয় কে বলতে পারে?”<sup>১৬</sup>

ওসমানের আত্মগত এই স্বগতোক্তিতেই মুক্তিযুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজের  
আর্থিক পরিবার সর্বস্বতার মাকড়সার জীবনকে বুঝতে অসুবিধে হয় না। ওসমান, আবদুল  
গণিরা বৈষয়িক। মৃতমেয়ের হাহাকার থাকলেও বাঁচার স্বার্থে তারা হাশেমরই সহযোগিতা  
চায়। যারা এই পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল দালাল। ওসমান, আনিসদের মতো মধ্যবিত্ত মন  
সমাজ জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা চায়। আয়েশ-আরাম চায়। তার জন্য তাদের যে পথেই  
নামতে হোক, তাতে তারা কখনোই নিমরাজি নয়। এমনকি এতে তাদের কোনো যায় আসে  
না। এই অভ্যন্তরীণ মুখাভোগের ইচ্ছা মধ্যবিত্ত প্রাণে আছে বলেই বাংলাদেশ আজ অবক্ষয়িত;  
এর কারণ রূপে ইলিয়াস সাহেব জানিয়েছিলেন প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি  
বাংলাদেশে এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্র্য থেকে হয়েছে আরও দরিদ্রতর। পরিণামে  
বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির অন্তর্গত ব্যবধানে আরো প্রকট হওয়াই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল।  
তাঁর জীবনাভিজ্ঞতায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একটি সাক্ষাৎকারে জানান—

“১৯৮১ সালে আমি রাঙা মাটি ও বান্দরবনের কয়েকটি জায়গায়  
গিয়েছিলাম। বান্দরবনে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলাম চট্টগ্রাম  
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুরং ছাত্রকে। তখন নিজের চোখে দেখে  
এবং পাহাড়ি ও বাঙালি অধিবাসীদের মুখে কখনো একই রকম  
কখনো পরস্পর বিরোধী কথা শুনে ওখানকার অবস্থা অনেকটাই

আঁচ করতে পারি।”<sup>১৭</sup>

এখান থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ইলিয়াস সাহেব তাঁর লেখার উপাদান সংগ্রহে গ্রামের অভ্যন্তরেও ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন। এতে করে তিনি গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে সাক্ষাৎরূপে পরিচিতিও পান। তাঁর ‘দুখেভাতে উৎপাত’ (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫) গল্পগ্রন্থের প্রায় প্রতিটি গল্পই বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের অনুষঙ্গে। ‘পায়ের নিচে জল’ আরেকটি অসাধারণ গল্প। বিষয়ে, বর্ণনায়, লিপি- কৌশলে এমনকি চরিত্রের তৎপরতা মিলিয়ে এই গল্প গ্রাম বাংলার যে কোনো গ্রামের প্রতিনিধিত্বের ‘টাইপ’ গ্রাম হয়ে উঠেছে। গল্পের প্রেক্ষাপট রূপে উঠে এসেছে—

“বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষগুলো প্রতি মুহূর্তে শোষিত হচ্ছে নানাভাবে। শোষণের কূটকৌশল এরা বুঝতেও পারে না। শোষিত শ্রমজীবী মানুষ জানে না যে তারা জোতদার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা কোন অদৃশ্য চালে আবদ্ধ। যতটুকু পারে ততটুকুরও প্রতিকার করতে পারে না কারণ প্রতিবাদের ভাষা ওদের জানা নেই। ভাঙন কবলিত মানুষের দুর্দশা বর্ণনাই ‘পায়ের নিচে জল’ গল্পের প্রেক্ষাপট।”<sup>১৮</sup>

গল্পে শোষক আলতাফ মৌলবি একদিকে যেমন গ্রামের প্রধানের ভূমিকা পালন করে তেমনি আবার তিনি এই এলাকার ভূত পূর্ব শোষক জেঁক। যার একমাত্র ভয় যমুনার বাঁধ ভাঙ্গার। এই বাঁধে অস্থায়ী আশ্রয় গ্রহণ করা সাধারণ মানুষদের প্রায় সকলেই তারই দ্বারা শোষিত, নিরাশ্রিত। দিনে দিনে এদের সংখ্যা ক্রমে বাড়ন্ত তার দ্বারা। বাঁধ ভাঙলে হবে অর্থের অপচয়, এই তাঁর মূল আশংকা—

“এই যে বান্দের উপরে দাপাদাপি বাঁপাঝাপি বান্দ একবার ভাঙলে এক ঘড়ির মধ্যে থানা হাসপাতাল ইস্কুল ব্যামাক পয়মাল হয়। যাবো না? ... ‘গওরমেন্ট ডেভলপমেন্টের জন্যে এতো টাকা ঢালবা লাগছে, ব্যামাক এ্যারা সান্দাবো নদীর প্যাটের মধ্যে। অর্থের অপচয়! অর্থের অপচয়!’ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে সমীহ করার জন্য আলতাফ মৌলবি শক্ত শক্ত কথা ব্যবহার করে।”<sup>১৯</sup>

শুধু সাধারণ মানুষ নয় গভর্নেন্টের কাছ থেকেও সে মুনাফা ভোগ করে তাই সরকারি সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব পরক্ষে তারই। এদিকে এই নিরাশ্রয় মানুষেরাই আবার তার কাছে কাজ চায় ভিক্ষে না। এই মৌলবির কাছে আসে ইউনিভার্সিটির সোসিওলজির মেধাবী ছাত্র আতিক। নিজেদের বর্গাজমি বিক্রি করতে যার উপর জীবিকা নির্বাহ করছিল কিসমত মৃধার পরিবারেরা। আতিকের জমি বিক্রির কারণগুলি হল ধানমণ্ডির বাড়ি মেরামত, আর সেজ ভাইয়ের হাভার্ডে পড়ার খরচ সংগ্রহ করা। মৌলবির সাথে আতিকের বাবার সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ। কিন্তু আতিক বাড়ির সুহৃদ্যপূর্ণ আতিথ্য পায় ও নিজের মৃত বাবার নতুন পরিচয় লাভের সুযোগ পায়। এই ঘটনার পর আতিকের হয়ে মৌলবি বলে সে জমি বিক্রি করতে এখানে এসেছে। তখনও আতিক, মৌলবি, কিসমত মৃধার দারিদ্র্যের ভাত খাওয়া চলেছে। আতিক অনুভব করে মৃধার হার্দিক আচরণ, আতিক আর তাই জমি বিক্রির কথা বলতে পারে না। সেখান থেকে আতিক একপ্রকার পালিয়ে যায়। একদিকে স্বচ্ছলতা, আয়েশ-আরাম কামনাকারী আতিকের জমি বিক্রিটা যেমন প্রয়োজন হয়ে পড়ে তেমনি তাতে বাদ সাধে তার নীতি, মানসিকতা, মানবিকতা। মধ্যবিত্তের এই দুমুখো দ্বিধা বিভক্ত চরিত্রে মধ্যবিত্তরা আতিকের মত পালিয়েই যায়। আর মৌলবির চক্রান্তে কিসমত মৃধাদের ঠাঁই হয় এই বাঁধেই। তবে এই গল্প আশাবাদীতার গল্প শোনায় বাঁধ ভাঙার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের গণআন্দোলনকেই হয়তো লেখক বোঝানোর প্রয়াস করেছেন এখানে। শহরে প্রয়োজনাতিরিক্ত চাওয়ায় নিঃস্ব হয় গ্রামের মানুষেরা। পাশাপাশি গল্পকার ইলিয়াস সাহেব এও কি দেখান নি, স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশ মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন আঁকড়ে থাকে গ্রামের জমির ওপর। নদী ভাঙন ও ভাঙন কবলিত গ্রামীণ নিম্ন অর্থনীতিতে মানুষের বয়ে চলা স্বাভাবিক জীবনচিত্রের পুনারাবৃত্ত চেউ যেন এই গল্প—

“আবার সেই বাঁধ; বাঁধে সার বাঁধা নতুন ও পুরনো চালা ঘর।

আবার সেই সব কালোকিষ্টি মানুষ, আবার অপরিচিত আশঁটে

গন্ধ। নীচে চড়ের ওপারে নদীর ভেতর থেকে মেঘ ডেকে

উঠল।”<sup>২০</sup>

মুক্তিযুদ্ধের সুফল গ্রামে পৌঁছালেও আলতাফ মৌলবির হাত থেকে গ্রামীণ অর্থনীতি হস্তান্তরিত হয় না, ফলে গ্রাম যুদ্ধ পরবর্তীতেও সুখ শান্তির আলো দেখতে পায় না।

“ক্ষণকাল সে নকল স্বর্গলোকের আমি নতজানু রাজা  
কানাকড়ির মূল্যে যা দিলে জীবনের ত্রিকূলে তা নেই  
অচির মুহূর্তের ঘরে তোমরাই তো উজ্জ্বল ঘরনী  
ভ্রাম্যমানেরে ফিরিয়ে দিলে ঘরের আঘাণ,  
তোমাদের স্তব বৈ সকল মূল্যবোধ যেন ম্লান!”<sup>২১</sup>

শোষণে সকল মূল্যবোধ ক্ষয়িষ্ণু। শোষণের চূড়ান্ত সীমায় বিপ্লব অনিবার্য। অর্থনীতির শোষণ যন্ত্রে সাধারণ মানুষ ক্রমশ নিষ্পেশিত হয়ে যায়। সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ এমনকি নিম্নবিত্ত মানুষদের উপর এই অত্যাচার ক্রমশ অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়। কিন্তু আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সময়ের নতজানু রাজাদের জাগিয়ে তুলতে এবং বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে রচনা করেছেন ‘দখল’ নামক গল্পটি।

‘দখল’ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের কয়েকটি বছর। রক্ষা বাহিনীর স্বার্থের পাহারাদার বিবেচনা করায় অনুমান করা যায় লেখক আওয়ামী লীগ-এর শাসনামলকেই চিহ্নিত করেছেন। এখানেও দুই শক্তি। একদিকে বুর্জোয়া সরকার সমর্থক গ্রাম্য জোতদার অন্যদিকে ভূমিহীন মানুষ-কাহিনীর বিস্তৃতি ১৯৫০ অবধি রাজশাহী কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডের হত্যাকাণ্ড। এ পর্যায়ে লেখকের ও একটা গ্লোরিফাইড প্রবণতা নজরে পড়ে। তবে অর্থনৈতিক অবকাঠামো সহজেই চোখে উঠে আসে। মোয়াজ্জেম হোসেন যিনি গ্রামের প্রতিভূ তার দুই ছেলে এক মোবারক যিনি খাপড়া ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ডে মারা পড়ে। মৃত্যুর কারণ সাধারণ লোকের জন্য জোতদার বিরোধীতা করেছিলেন। তার জনশ্রুতি সারা গ্রামে আর অন্যদিকে মোতাহার, সে রাজনীতিতে নাম লিখিয়ে সহজেই করতে চায় নিজস্ব স্বার্থ পূরণ। মোয়াজ্জেম হোসেন সর্বদাই গ্রামের শাসক। তিনি চান তার মৃত্যুর পরে যেন জনপ্রিয় সন্তান মোবারকের কবরের পাশে তাকে কবর দেওয়া হয়। যা আগে থেকেই তৈরি করাও আছে। মোয়াজ্জেম পার্থিব জগতের অন্যায়গুলো পূরণ করতে চায় জনদরদী ছেলের পাশাপাশি কবরে শুয়ে। কিন্তু ইচ্ছায় বাঁধা মোবারকের ছেলে ইকবাল, জনদরদী পিতার জনশ্রুতি সে জেনে যায়। আর গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই গ্রামের লোকেরা যখন অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ইকবালের কাকা ও দাদুকে আক্রমণ করতে আসে তখন রক্ষা বাহিনীও অনেক দূরে থাকে।

শ্রেণি চেতনাই গল্পটির মূল উপজীব্য, স্বাধীনতার পর বুর্জোয়া গোষ্ঠীর প্রবৃত্তিকে

চিহ্নিত করতে দেখা যায় এই গল্পে। নির্যাতিত লোকেদের অর্থনৈতিক মুক্তি তখনও আসেনি। এমনকি তাদের কেউ শ্রমের মূল্য দেয়নি। সমাজ থেকে তখনও নির্মূল হয়নি শোষকের শোষণ ও নির্যাতন—

“এ অর্থ দেশের স্বাধীনতা উপভোগের জন্য অনুকূল প্রতিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, যে প্রতিবেশে থাকবে ব্যক্তিজীবনে মর্যাদা ও স্বতন্ত্র সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা। সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রেয়ঃ বরণের ও সংস্কার বর্জনের প্রবণতা, জীবিকার ক্ষেত্রে সমসুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্ব নিষ্ঠা ও অধিকার-চেতনা।”<sup>২২</sup>

মুক্তিযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পরিবেশে এই আশাপূরণ হয়নি বলেই ইলিয়াসের গল্প কণ্ঠে খেদ বাড়ে পড়ে নিয়ত নিরন্তর।

“দোজখের ওম” (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯) গল্প গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল ‘যুগলবন্দী’। আসগর, সারোয়ার কবিরের বাড়িতে ফরমাস খাটে। আসগর পিতা অবসর প্রাপ্ত পোস্ট মাস্টার; মা ও ছোট ভাইকে নিয়ে তাদের সংসার। ফরমাস গিরিতে আসগরের হাতে আসে কাঁচা টাকা। এতে বাড়ে সংসারের আভিজাত্য ও পরিবারের সবাই গলগ্রহ করে আসগরের। এই কারণে আসগর মালিক সারোয়ারের যেকোনো কাজ যেকোনো সময় করতে বাধ্য হয়। দিন রাত তার কাছে কোনো মায়না রাখে না অর্থাৎ ব্যক্তিগত নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রাধান্য তার জীবনে নেই। স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ অথচ ব্যক্তি স্বার্থ পরাধীন। সাহেব সারোয়ারের চাকচিক্যময় জীবন যাপন তার ইচ্ছায় আছে বলেই সে এধরণের কাজ করে। যোগ্যতার মাপকাঠি মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ অর্থনীতিতে অনেকটাই পিছনের বেষ্টিতে বসে, তাই যোগ্যতার চিন্তা আসগরের মাথায় আর ঘোরে না। তবে মাঝে মাঝে আসগরের ইচ্ছে করে নিজেই এ গলগ্রহ পূর্ণ জীবন ত্যাগ করে মোটা অর্থের কোনো কাজে নেমে পড়বে। কিন্তু নিরাপত্তার অভাবে সর্বদা শঙ্কিত আসগর তাই আর তার ইচ্ছার মান্যতা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আশায় প্রভাবশালী অর্থবান ব্যক্তিদের লেজুরবৃত্তি একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান সমাজে। কিন্তু এই বৃত্তি বর্তমান সমাজ প্রকৃতিতে প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিকর। যে-কোনো কাজে যাওয়া অসম্মানের নয় কিন্তু আত্মসম্মান বিকিয়ে দেওয়ার মধ্যে

কোনো স্বার্থকতা নেই হয়তো বা সেখানে অর্থ থাকতে পারে। সামান্য অর্থের একটি চাকরি জেটাতে আসগর সরোয়ার সাহেবের কুকুরের দায়িত্ব সামলায়। আবার সরোয়ার বি. কবিরের হুকুম শোনা মাত্র সে সচকিত হয়ে ওঠে। এর মূল কারণ অবশ্য চাকরির উমেদারি—

“আসগর, তোমাকে তো একটু কষ্ট করতে হয়। পারবে? কুশন ঢাকা মোড়ায় বসে বসেই আসগর এ্যাটেনশন হয়। একই সঙ্গে অভিভূত চোখে তাকায়, সায়েব কীরকম পোলাইট, কী তার এটিকেট! আসগর হোসেন কী? না, তার বোনের চাচাতো না মামাতো দেওয়ার বন্ধু। এটা কোনো সম্পর্ক হলো? আসলে তো চাকরির উমেদার। তাকে সোজাসুজি হুকুম করলেও পারে।”<sup>২০</sup>

আসগররা হল আধুনিক সমাজের সংস্করণ। যারা হল আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভেঙ্গে যাওয়া প্রতিধ্বনি। এরা সরোয়ার সাহেবের সাথে, পরিজনদের বাঁচাতে চায় কিন্তু সমাজের আরোগ্য, পিপাসু সুস্থ জীবন অস্তিত্বের মানুষ হতে চায় না। বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজে হয়তো এদের প্রতিষ্ঠা আছে কিন্তু নিগ্রহতাও কম নেই। আর সে জন্যই লেখক ব্যঙ্গ করে ‘আসগর’ ও ‘আরগস’ (সাহেবের কুকুর) নামের সামঞ্জস্যতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

আমরা জানি যে কোনো সমাজের মূল ভিত্তি অর্থনীতি এবং তার উপরিসৌধ হল রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি অন্যান্য সব কিছু। এই ভিত্তি প্রস্তুত যদি দেখা যায় তবে বলা যায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রতিটি গল্পে সমাজের সংকট, ক্ষত, বেদনা ইত্যাদি নানান নৈরাস্যের চিত্র প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। প্রতিটি গল্পই তাঁর গড়ে উঠেছে আর্থ-সামাজিক বুনியাদের উপর ভর করে। এই বুনিয়াদি আর্থ-সমাজ কিন্তু নির্ভর করে আছে মধ্যবিত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে। শুধু ইলিয়াস সাহেব নন প্রত্যেক গল্পকারই জানেন যে মধ্যবিত্তই হল সমাজের মূল ভিত্তি রূপ। আর তাই না ইলিয়াসের প্রতি গল্পেই ফুটে উঠতে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধোত্তর বর্তমান বাংলাদেশের ‘ফোঁড়া’। রাজনীতিবিদ মানুষেরা সমাজে বসবাসকারি নিম্নবর্গীয় মানুষের মনের অন্তরে গজিয়ে ওঠা ফোঁড়াকে দেখতে পায় না। এমনকি না দেখার প্রবণতাই বেশি করে ধরা পড়ে সমাজ চিত্রে। বর্তমানে অর্থের হাঁটে রাজনীতি, মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ সবই বিকিয়ে যাচ্ছে। ‘ক্ষুধা’ কি তার নৈতিকতা মানতে চায়, জানি চায় না; চায় না

বলেই নইমুদ্দিন মামুনের টাকা পেয়ে ঈদ মানাতে চলে যায়। টাকা যেভাবেই আসুক তাকে সঞ্চয় করে রাখলে ক্ষুধা মিটবে না। সাধারণ জীবনের অর্থ বিবেকহীন করে তুলছে মানুষের জীবনকে। এই নিঃস্রাণ জীবন চিত্রই গল্পকার তুলে ধরতে চেয়েছেন আমাদের সামনে।

“ব্যক্তির অস্তিত্ব যেহেতু দেহ-মন বিশিষ্ট জৈবসত্তা সেহেতু তার বৃদ্ধি ও বিকাশের পক্ষে কতগুলি উপাদান জরুরি-খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। এগুলি পাওয়ার জন্য ব্যক্তিকে ‘আয়’ করতে হয়। ‘আয়’ করার অর্থ নিজেকে বিক্রি করা। এবং যে কোনো ক্রয়-বিক্রয় ‘বাজার’ নির্ভর। নিজস্ব স্বার্থ তার অস্তিত্বের সঙ্গে বিজড়িত এবং ঐ স্বার্থই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গতিধর্মের উৎস—অতএব, বলা যায় ব্যক্তির অস্তিত্ব বাজারের সঙ্গে যুক্ত।”<sup>২৪</sup> খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার মূলে অর্থ লুনি নদীর ন্যায় প্রবাহিত। পরিবার স্বার্থ রক্ষার্থে পরিজনদের নানান উপায় অবলম্বন করতে হয় অর্থের জন্য। ইলিয়াস আলোচ্য বিষয়ে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল ছিলেন আর ছিলেন বলেই তাঁর কলম উগ্রে দিয়েছে ‘কান্না’ (১৯৯৪)-র মতো অনবদ্য, অসামান্য গল্প। ‘জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল’ (১৯৯৭) গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত গল্পটিতে পিতা আফাজ আলী সন্তানের শিক্ষা যেন সুসম্পন্ন হয় তার জন্য অন্যের কবর খোঁড়ে, প্রয়োজনে কান্না করে করে আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করে যেন মৃত ব্যক্তির আত্মা-শান্তি পায়। এর বিনিময়ে শেঠ শেঠ পার্টির কাছ থেকে সে মোটা টাকা আয় করে। আফাজ আলী গল্পে কান্নার ফেরীওয়ালা। কান্নাই তার জীবনের মূল অর্থনীতি। কান্নাই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। উচ্চবিত্ত সমাজ ব্যবস্থায় শোষণ, শাসনে পরে আফাজ আলী এই পেশা বেছে নেয়। “জীবন ও মৃত্যু, বাস্তব ও কল্পনা, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, বস্তু বিশ্ব ও রোমান্টিকতা, কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাস, জীবন-সংগ্রাম ও সংঘর্ষ—এ সমস্ত বিষয় নিয়েই ‘কান্না’ গল্প লিখিত। প্রবল ধর্ম বিশ্বাসে বলীয়ান আফাজ আলী নিজে গোরস্তানের মৌলবি অথচ পুত্রকে গড়ে তুলতে চায় আধুনিক করে, বাস্তব সম্মত উপায়ে।”<sup>২৫</sup> আফাজ আলীর কেন এত প্রচেষ্টা, কেন এত অর্থের দরকার, এর কারণ গল্পের শরীরে সুন্দর ভাবে দেখা যায়—

“আফাজ আলি বিড়বিড় করতে করতে সবুজ সোয়েটার ও সবুজ-হলুদ চেক-কাটা লুঙিকে আরেকবার দেখে, লোকটি কৃষ্ণকাঠির কুদ্দুখ হাওলাদারের ছেলে। মনুমিএগ, আফাজ আলির ছেলের চাকরির ব্যাপারে কয়েকবার বরিশাল আসা-যাওয়া করেছে। দেখা হলেই টাকা, দেখা হলেই টাকা। একে এত দিলে

চাকরি হবে, ওকে এত না দিলে হওয়া চাকরিটা ফসকে যাবে।”<sup>২৬</sup>

এখান থেকে আমরা বর্তমান বাংলাদেশ শুধু নয় সমগ্র বিশ্বে চাকরির বাজারে দুর্নীতি এক চাক্ষুস জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করতে পারি। অর্থনীতি নির্ভর বাজার সমাজে নীতি আদর্শ যেন আজ টাকায় বিকিয়ে গেছে। ইলিয়াস সাহেব পর্দার ওপারে অর্থনীতির কালোবাজারি অবস্থাকেও এই গল্প দ্বারা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

এই রকমভাবে বিভিন্ন গল্পের নিরিখে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তুলে ধরেন বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভাবনা ও সমাজের কর্ণধার মধ্যবিত্তদের রুচিও মননকে। তবে এ মনন শুধু মুক্তি যুদ্ধোত্তর বাংলার নয় এ যেন সকল বিশ্ব সংসারের অর্থনীতি নির্ভর ভোগ প্রবণতা কাটাতার বন্ধ থাকতে চায় না। কথা বলতে বলতে তাই শেষ করছি বর্তমান সময়ের বিশেষ ভাবনা মাথায় রেখে—

“ভোগ প্রবণতা আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আগে যে সংযম আর আত্মানুশীলনের প্রাচ্য শিল্পময়তা আমাদের মধ্যে ছিল, আমরা আসলে সংযমের সেই শিল্পকেই হারিয়ে বসেছি। বিশ্বায়ন আর বাজার অর্থনীতি এক্ষেত্রে হয়তো আমাদের উস্কে দিয়েছে, প্ররোচনা দিয়েছে, বাড়তি ভোগ্যদ্রব্য দিয়েছে কিন্তু একমাত্র সে-ই আমাদের মধ্যে ভোগ প্রবণতা সৃষ্টি করেছে, এমনটা তো বলা যায় না। আসলে আমরা ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে এসেছি আমি-র অসুখ নিয়ে। স্বখাত সলিলে ডুবতে ডুবতে আমাদের এখন শুধু একটা প্রশ্নের মধ্যেই ক্রমাগত আবর্তিত হতে হচ্ছে— গ্লোবলাইজেশন থেকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং -এ ‘পঁছঁছিতে’ আর কত দেরি আছে?”<sup>২৭</sup>

#### খ. গল্পে রাজনৈতিক ভাবনা ও বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ:

“বাসনার জনারণ্যে প্রবঞ্চিত হে মুগ্ধ মানুষ  
... শক্তির সীমারে লঙিঘ অসীম গরবে  
... অস্তারে হানিল অপমান  
বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা জাগে মানুষের প্রাণে।  
সাম্রাজ্যের ক্ষুধা  
... মানুষে মানুষে জাগে স্বার্থের সংঘাত  
... চলছে ধ্বংসের খেলা, পূর্বে ও পশ্চিমে  
... যুদ্ধ, ধ্বংস-বিভীষিকা, হত্যা ও লুণ্ঠন,  
দিকে দিকে আর্তের ক্রন্দন  
সর্বহারা মানুষের ওঠে হাহাকার।”<sup>২৮</sup>

বাংলাদেশ তথা গোটা বিশ্ব রাজনীতির পরিণামি দশা এইরকমই। জনগণ নিয়েই যেখানে সব কিছু সেখানে জনগণই শোষিত নির্যাতিত। রাজনীতি কি জিনিস সে বিষয়ে শহীদ ইকবাল এক সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন—

“পরিভাষা হিসেবে ‘রাজনীতি’ শব্দটিকে বিবেচনা করলে,  
রীতি মতো তার সংজ্ঞা দাঁড়ায় নীতির রাজা কিন্তু বাহ্যত  
তা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজার নীতি। ‘জনগণের রক্ত শোষণ  
করে- যে রাষ্ট্র কাঠামোর শ্রীবৃদ্ধি তার নামে তাকেই খারিজ  
করতে চাওয়ার যে চতুর বুদ্ধি সেও রাজনীতিই বটে।”<sup>২৯</sup>

অতীত রাজার নীতি সময় বিবর্তনে ডারউইন, ল্যামার্ক এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন নীতি পেরিয়ে জনগণের হাতে এসে পড়ে। বংশ পরম্পরার জনগণ শাসনের যুগ আজ নির্বাসনে, বিদ্রোহ আন্দোলনের পথ সোপান অতিক্রম করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, রাজার নীতি আসনে। কিন্তু ‘যে যায় লক্ষায় সেই হয় রাবণ’ প্রবাদ বাক্য যুগে যুগে কীভাবে যে সত্য হয়ে যাচ্ছে তা বোঝা যায় কিন্তু নাগাল পাওয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু রাজার নীতি আসনে সাধারণ মানুষ মধ্যবিত্ত সমাজ প্রতিনিধিকেই নির্বাচন করে শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যাস্ত করে। ফল যা এতকাল

হয়েছে তাই, তবে প্রাচীরের অত্যাচার ব্যবস্থার নামান্তর ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর রাজনীতির পরিবেশে। '৭১-এর পরবর্তী রাজনীতিতে বাংলাদেশে বুর্জোয়া সমাজ প্রবলভাবে ঢুকে যায়। শেখ মুজিব যার অন্যতম দৃষ্টান্ত এই মুজিব প্রসঙ্গে আমাদের মূল আলোচনার কেন্দ্রীয় গল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস শাহাদুজ্জামানকে এক সাক্ষাৎকারে জানান—

“মুজিব সম্পর্কে যাই বলি না কেন, তাঁকে hero তো বলতে হবে। তাঁকে দোষ দিয়ে কী লাভ। তিনি যে Politics -এ বেড়ে উঠেছেন সেটা পার্লামেন্টারি Politics, তিনি Election করেছেন, Opposition -এ ছিলেন, তাঁর পক্ষে এর চেয়ে বেশি আর কী করা সম্ভব? উনি কি আর বিপ্লবী নেতা? মানুষের ওই বিশাল অভ্যুত্থানকে উনি আর কতদূরই-বা নিয়ে যেতে পারতেন? উনি তো সমাজ বিপ্লবী নেতা নন। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত নেতাদের মধ্যে বুর্জোয়া রাজনীতিতে তিনিই সবচেয়ে Successful।”<sup>৩০</sup>

ইলিয়াস সাহেব তাঁর গল্পে রাজনৈতিক পরিবেশকে ব্যবহার করেছেন সময়ের দাবিতে। তবে তাঁর গল্পে রাজনৈতিক পরিবেশ খুব বেশি পরিমাণে নেই। এই না থাকার কারণ অনুসন্ধানে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি—

“মুক্তিযুদ্ধ খুব ইতিবাচক ভাবে আসেনি। আসলে মুক্তি যুদ্ধের পরের সময়টা তো চরম frustrating, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের দারুণ স্বপ্ন ছিল। সে কী সীমাহীন স্বপ্ন! এত স্বপ্ন দেখার তো কোনো মানে হয় না। মুক্তিযুদ্ধ তো তেমন organized কিছু ছিল না, তা ছাড়া এর definite কোনো goal ও ছিল না। সাধারণ মানুষ বা কৃষকরা যে যুদ্ধ করেছিল তা তো কোনো আদর্শ থেকে করেনি। করেছে, কারণ না-করলে তারা মারা পড়ত। আর মুক্তি যুদ্ধের পরের সময়টা তো চরম স্বপ্ন ভঙ্গের কাল।”<sup>৩১</sup>

এখান থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে বাংলাদেশের রাজনীতির

কোনো সঠিক নীতি ছিল না। আর ছিল না বলেই বারবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ এখন পরিবর্তন প্রক্রিয়া অধীনে; যদিও এই পরিবর্তন শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে আমরা দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি—

প্রথম পর্যায় : ১৯৪৭-১৯৭০

দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৭২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

১৯৫১ সালে পাকিস্তানের জন্য ৬ বছর (১৯৫১-১৯৫৭) মেয়াদী এক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় যাকে কিনা ষষ্ঠ বার্ষিকী পরিকল্পনা বলা হয়। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র কমিশন গঠন করা হয় এবং ১৯৫৫ অর্থ বছরে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার কাজ শুরু হয় (১৯৫৫-৬০)। রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধারাবাহিক কার্যক্রমের অভাবে নানান প্রশ্ন সমাজ বুকে দানা বাঁধলে পাকিস্তান সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে (১৯৬০-৬৫)। পরিকল্পনার আনুমানিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল ব্যয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়ে যায় ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্র পুনরায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬৫-৭০) করে। এই পরিকল্পনাও খুব বেশি সাফল্য পায়নি। পায়নি বলেই ১৯৭১ সালে বাংলায় জনগণের মুক্তিযুদ্ধ দেখা দেয়।

স্বাধীন হয় বাংলা রাষ্ট্র ১৯৭২ থেকে রাজনৈতিক মহলের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়।

“পিণ্ডিতে অবস্থিত তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সাথে এক সশস্ত্র সংঘাতের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসে। ১৯৭১ -এর পুরো বছরটি ছিল একটি সংগ্রামের বছর এবং তার ফলে অপরিমেয় সম্পদ, জীবন ও অন্যান্য সম্পদ হানি ঘটে। এতে প্রশাসনিক কাঠামো সংহত করতে, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামো পুনর্গঠন করতে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে বেশ কিছু সময় লাগে। কাজেই বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর শাসন পরিচালনার রাজনীতিতে আরো কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত।”<sup>৩২</sup> যেমন—

বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-১৯৮০)

বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৮৫)

বাংলাদেশের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-১৯৯০)

বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-১৯৯৫)

প্রভৃতি সকল পরিকল্পনা গঠন করে বাংলার রাজনীতি ক্রমে এগিয়ে গেছে গুটি গুটি পায়ে ভর করে। এই পরিকল্পনাগুলির মূল লক্ষ্য বস্তুতে আমরা যে সকল দিক খুঁজে পাই তা মূলত—

ক. বাংলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা

খ. বাংলার মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি

গ. জনগণের নিজের উপর আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি করা।

তবে আমরা পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বে পরিবর্তন এবং পরিকল্পনার মূল চিন্তাধারায় নানান পরিবর্তন ঘটতে দেখি। এই পরিবর্তনগুলির স্বরূপ আমরা ইলিয়াসের গল্পে নানান ভাবে প্রতিভাত হতে দেখব গল্পের মূল আলোচনায়। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে রাজনৈতিক চিন্তা প্রসূত পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত ফলাফল দেখে নিলে আমাদের মূল লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর পথ নরম হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

‘বাংলাদেশে পরিকল্পনা ও এর কার্য সম্পাদন ধারা (১৯৭৩-১৯৯৩)’<sup>৩৩</sup>

ক্রমিক নং	পরিকল্পনা ও মেয়াদ	মিলিয়ন টাকায় পরিকল্পনার আয়তন	মিলিয়ন টাকায় প্রকৃত ব্যয়	আয়তনের হিসাবে শতাংশ	মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার	লক্ষ্য	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
১	প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (৭৩-’৭৮ অর্থবছর)	৪৪,৫৫০	২০,১৪০	৪৬.৫%	৫.৫%	৪.০০%	
২	দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (৭৮-৮০ অর্থবছর)	৩৮,৬১০	৩৩,৯৫০	৮৬.৯%	৫.৬%	৩.৫%	
৩	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (৮০-৮৫ অর্থবছর)	১,৭২,০০০	১,৫২,০০০	৮৮.৯%	৫.৪%	৩.৮%	
৪	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (৮৫-৯০ অর্থবছর)	৩,৮৬,০০০	২৭,০১১	৬৯.৯%	৫.৪%	৩.৮%	
৫	চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (৯০-৯৫ অর্থবছর)	৬,৭২,৩০০	-	-	৫.০০%	-	

আমরা এখানে মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে পরিকল্পনার আয়তন, প্রকৃত ব্যয় এবং মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হারে সংক্ষিপ্ত একটি ক্রম তালিকা উপস্থাপন করেছি।

আমাদের আলোচ্য আলোচনায় বাংলাদেশ যুগে (১৯৭১- বর্তমান সময়কাল) যে সকল রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে তারও একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপভোগ করার চেষ্টা করবো—

ক. ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ কাল পর্বে দেখা যায়—সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২-এ একটি নতুন সংবিধান চুল করে এবং ১৯৭৩ সালে কিছু লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে প্রশাসন, ও

চাকুরি বিষয়ক কিছু কমিটি গঠন করা হয়—

১. প্রশাসনের ইউনিট হিসাবে মহকুমার বিলুপ্তি সাধন করা হয়।
২. প্রত্যেক মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয়।
৩. থানা প্রশাসন ব্যবস্থার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া।

খ. ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সময় পর্বেও পরিবর্তন দেখা যায় ১৯৭৬ এ ১৯৬১ সালে গড়ে ওঠা পুলিশ অ্যাক্টের আওতায় যে পুলিশী বিষয়ের উপর ম্যাজিস্ট্রেটদের হস্তক্ষেপ নীতি এবং ১৯৪৩ সালের পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল প্রচলিত ছিল তা বাদ দেওয়া হয়। শহর তথা মহানগর এলাকায় ফৌজদারী ন্যায় বিচারের জন্য চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রধান পদে নিযুক্ত করে মেট্রোপলিটন শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো হয়। ১৯৭৭-৮০ সালের মধ্যে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ১২টি মহকুমা নতুন করে তৈরি করাও হয়।

গ. ১৯৮০-৯০ সময় কালে রাজনৈতিক মহল নতুন ভাবে নিজেদের কার্যক্রম আরো সুগঠিত করে তোলে। এখানে ১৯৮২ সালে পূর্বতন প্রধান সামরিক প্রশাসন-এর গঠন করা প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পরিবর্তন আনে—

১. বিদ্যমান সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়,
২. বিদ্যমান সব থানাকে উপজেলা হিসেবে মর্যাদা দান।

এই গৃহীত নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরকারকে ৪৬০টি উপজেলা এবং ৬০টি জেলা গঠন করতে হয়। রাজস্ব, ফৌজদারী এবং পুলিশ ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন এখানে আনা হয় না, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট এলাকার দায়িত্ব সংকুচিত করা হয়। এই উপজেলা গঠনের কিছু সমস্যা দেখা দেয় সরকার কর্তৃপক্ষে এ যেন ‘শতাব্দী প্রাচীন আমলাতান্ত্রিক লোক প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যে আমলাতন্ত্রের উপর নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণকে একটি গণতন্ত্রের দ্বীপ বলে মনে হতো।’<sup>১৪</sup> যার দরুণ ১৯৯১ সালে সরকার নিয়ন্ত্রিত উপজেলা পদ্ধতি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়।

আমরা এই সকল রাজনৈতিক দোলাচলতায় মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন কতটা প্রভাবিত হয়েছিল বা তাদের জীবনে কতটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল তারই এখন পরিকল্পিত আলোচনায় নিবন্ধ হবো আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প পিঠে সওয়ালী হয়ে। আলোচক শহীদ ইকবাল

ইলিয়াসের রচনায় রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন—

“আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যের প্রধান অধিষ্ঠ রাজনীতি। তিনি বলেন : ‘সমাজ ও রাজনীতিবোধ শিল্পচর্চার জন্য অপরিহার্য শর্ত।’ আধুনিক সমাজ ও সময়ের সাথে রাজনীতির যোগাযোগ ওতপ্রোত। নিত্য জীবনাগ্রহে প্রতিটি বিষয় দেখানো রাজনীতি অনুষ্টি। বাংলাদেশের তথা বাঙালির ইতিহাস এক সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস। ক্রম পরিণতির মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম, বাঙালি জাতি তার আত্ম অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে— তা অনিবার্য ভাবেই রাজনৈতিক চেতনা সম্ভূত। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস দারুণ সমাজ—সচেতন শিল্পী। কোন তত্ত্বকে আরোপ না করে নির্মোহ দৃষ্টিতে, বাস্তবতার কষ্টি পাথরে সমাজকে আরাধ্য জ্ঞান করেন তিনি।”<sup>৩৫</sup>

এখন আমরা একে একে ইলিয়াস রচিত গল্প সমূহের মধ্যে চিরুনি চালিয়ে রাজনীতি-ভাবনাকে তিনি কীভাবে তুলে আনার চেষ্টা করেছিলেন, সেই ভাবনাকে তুলে আনার প্রয়াস করবো।

‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ (১৯৬৫-৭৫) গল্প গ্রন্থের নাম গল্পে গল্পের নায়ক প্রদীপকে দেখতে পাই। প্রদীপের পরিবার হিন্দু পরিবার। তাদের পৈতৃক ভিটা এই বাংলাদেশ। বংশ পরম্পরায় তারা এই বাংলার মাঠ-ঘাট গ্রহণ করে আসছে। স্বাধীন বাংলাদেশের ন’মাসের দোসর পোহাতে হয়েছে তাদেরকেও। কিন্তু তবু আজ তারা স্বভূমিতে পরবাসী। প্রদীপের তিন ভাই-এর মধ্যে প্রদীপ ও তার এক ভাই থাকে কলকাতায় কিন্তু আরেক ভাই ননী গোপাল দেশের মায়া ছাড়তে পারেনি। বর্তমানে তার মেয়ের কলেজ যাবার সমস্যা, পাত্রস্থ করার সমস্যা, ব্যবসায় লাভের অংশ সমাজের তথাকথিত দাদা/ভাইদের বাধ্য হয়ে দেওয়া— প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে সংখ্যালঘু হয়ে জীবনবোধের গ্লানি বহন করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ননী গোপাল দেশের মধ্যেই আটকে থাকে। রাজনীতিগত বিভাগ মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে যেন বর্জসম নেমে আসে। “হিন্দু Minority সমস্যাকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস হিন্দুদের Supressed অবস্থার শিল্পিত রূপ দিয়েছেন নিশ্চিত অর্থেই— 'Minority Supressed' একটা ইউনিভার্সাল

প্রবেশ।”<sup>৩৬</sup> বাংলাদেশের মতো স্থবির অর্থনীতির দেশগুলোতে এর প্রতীড়ন আরো জটিল। এ সমাজ ব্যবস্থা গ্রাম্য-সামন্তবাদ এখনো প্রভুত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ। শাসন ব্যবস্থা এখনো ভঙ্গুর। মধ্যবিত্ত এখানে মৌলবাদের সঙ্গে হাত মেলায়। মানে সমাজে চলে মেলেটারির শাসন। খণ্ডিত পুঁজিবাদ রাষ্ট্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়; যেখানে সংখ্যালঘুরা ‘দ্বিতীয় শ্রেণির’ নাগরিক পর্যায়ে গণ্য হয়—ননী গোপালের পরিবার তারই নির্দেশিত উদাহরণ। শাহাদুজ্জামান গৃহীত সাক্ষাৎকারে ইলিয়াস এমনটাই জানিয়েছেন—

“তুমি যে-মুহূর্তে ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষণা করছ, সে-মুহূর্তে হিন্দুরা 2nd class citizen হয়ে যাচ্ছে।”<sup>৩৭</sup>

‘খোঁয়ারি’ (১৯৮২) গল্প গ্রন্থের নাম গল্পে ‘হিন্দু মাইনরিটির’ সমস্যা গভীর ভাবে করা যায় লক্ষ্য। রাজনৈতিক আবর্তে সংখ্যালঘুদের ফিকে হওয়া জীবনের চালচিত্র। ‘খোঁয়ারি’ গল্পে বাড়িটার যে বর্ণনা দেন ইলিয়াস তাতে স্পষ্টতই বোঝা যায়, বাড়িটি জীবন্ত নয়, যতই সেখানে মাধবীলতা থাকুক কিন্তু জীবন সেখানে নেই। ফারুক, জাফর ইখতিয়ার আসে অমৃতলালের বাড়িতে। অমৃতলালের ছেলে সমরজিতের বন্ধু জাফর যুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের শুদ্ধ রাজনৈতিক চরিত্র। তার সহযোগী বন্ধু ফারুক উঁচুদের রাজনৈতিক নেতা হলেও দায়িত্ব জ্ঞান বর্জিত অর্থলোলুপ, আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র। সে স্বার্থ সিদ্ধিতে সদা সচেতন। তার রাজনীতি মূলত অর্থনৈতিক ফায়দা লোটার। অপর বন্ধু ইখতিয়ার, মুক্তি যুদ্ধ চলা কালে দেশ প্রতারণক; অবক্ষয়ীত চরিত্র। তারা মূলত আসে সমরজিতের বাড়িটির নীচতলা রাজনৈতিক কাজে ভাড়া নিতে। কিন্তু বর্তমানে এই শূন্য বাড়ি আগলে বসে আছে সমরজিতের বাবা অমৃতলাল এবং সমরজিত নিজে। অমৃতলাল কিছুতেই বাড়ি ভাড়া দিবে না কাউকে; অধিক বয়সী অমৃতলালের এ অঞ্চলে প্রজন্মান্তরে প্রায় সবাইকে চেনা আছে। আজ যারা রাজনৈতিক নেতা ‘পুঁজিবাদী’ আমলা সেজেছে তারা একদিন অমৃতলালের উঠানে অল্পের জন্য দিনাতিক্রম করতো। এই গল্পের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি বর্তমান সমাজে—

“মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বড় অংশ নিজেদের সর্বাধিক ও শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। একজনের অবস্থান সমাজের কোন স্তরে, তিনি কি মধ্যবিত্ত না উচ্চবিত্তের অন্তর্ভুক্ত, মধ্যবিত্তের বিভিন্ন উপবিভাগগুলোর মধ্যে কোনটিতে তিনি বিরাজ করেন—এ সম্বন্ধে তার স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। এখন এখানে টাকা-পয়সা রোজগারের চোরাগুপ্তা অলিগলি এতো বেশি যে, যে কোন লোক একদিন বিস্তবান হবার স্বপ্ন দেখতে পারে।”<sup>৩৮</sup> আধুনিক রাজনীতির ধারণা এই গল্প থেকে আমাদের

কাছে আরো বেশি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সমরজিতের বন্ধু ভাড়া চাইতে আসা পার্টির প্রতিনিধি ফারুকের উক্তি—

“আমাদের তো আর রাজনৈতিক সংগঠন নয়, আমাদের ভয় পাওয়ার কি আছে? আমাদের পিওর উইথ ফ্রন্ট, আমরা মন্ত্রিত্ব চাই না, এমনকি উই রিফিউজ এ সীট ইন দ্য পার্লামেন্ট। আমরা শুধু দেখবো সাব ভারসিভ এলিমেন্টস বিপ্লবের নাম করে কিংবা গভর্নমেন্টের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশকে ধ্বংস করতে না পারে। নট ওনলি দ্যাট, আমরা এ্যালার্ট থাকবো যাতে কোরাপ্ট লোকজন আমাদের ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে ঢুকে রেইন করতে না পারে। একজনের কেবিশমার চাম্প নিয়ে দশজনে লুটেপুটে না খায়।”<sup>৩৩</sup>

‘দুখভাতে উৎপাত’ ( ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫) গল্প গ্রন্থের ‘দখল’ গল্পটির মধ্যে রাজনীতির শৈল্পিক ব্যাখ্যায়ণ নজরে সহজেই আসে। ‘দখল’ গল্পে টিপিক্যাল চরিত্র হল মোয়াজ্জেম হোসেন। দু’ছেলে তার মোবারক ও মোতাহার। মোবারক খাপড়া ওয়ার্ডের জেল হত্যায় নিহত। মোতাহার পেটি বুর্জোয়া। রাজনীতির সংগঠক, সর্বদা গায়ে তার মুজিব কোর্ট। চণ্ডিপুর গ্রামে তার বেশ দাপট। বড় ভাই মোবারকের মৃত্যুর পর তার যাবতীয় স্বত্ব মোতাহার নিজের নামে নিয়ে নেয়। পিতা মোয়াজ্জেম হোসেন এতে যথোচিত সাড়া দেয়। তাছাড়া আগাগোড়াই মোতাহার তার নিকট বরপুত্র। অপর দিকে মোবারক শ্রমিকদের বিপ্লবের দেয় মন্ত্রণা। যা কিনা রক্ষণশীল বুর্জোয়া মোয়াজ্জেম ভীষণ ভাবে অপছন্দ করতেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর বিপ্লবী মোবারকের হাকডাকে পুলক অনুভব করে মোয়াজ্জেম হোসেন। মনে মনে সে আওড়ায় জনপ্রিয় ছেলের সমাধি পাশে মৃত্যু পরবর্তী যেন তার হয় কবর। এদিকে মোবারকের ছেলে আসে পিতার সম্পত্তির ভাগ নিতে। এতে বীতশ্রদ্ধ এবং ভীতশ্রদ্ধ হয় ইকবালের কাকা ও দাদু। চণ্ডীগ্রামে এসে ইকবাল শোনে ২৩ বছর আগে বাবার ঘটিয়ে যাওয়া শ্রেণি সংগ্রামের কাহিনি এবং এও দেখে কাকু ও দাদুর অত্যাচারে শ্রমিকদের অবস্থা দুঃসহনীয়। শেষ অবধি অত্যাচারিত লোকেরা ইকবালের দাদু ও কাকুকে আক্কেশমণ করলে ইকবাল বাবার কবর আগলে থাকে বসে। মোয়াজ্জেম হোসেনরা যখন রাজনীতির ছত্রছায়ায়

শেষের জাল বিস্তার করে তখন আমাদের পরিবর্তিত রাজনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেন। সেখানে শোষণ বদলায়নি বদলেছে শাসক। এই মোয়াজেজম হোসেনরা যেমন ব্রিটিশ রাজকে ভাল মনে করে আবার পরবর্তীতে প্রবর্তিত রাজনীতিতেই অবগাহন করে স্বার্থসিদ্ধিতে যুক্ত হন। এদের অবস্থা যেন ঠিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘অতঃপর’ কবিতার মত—

“এতৎ সত্ত্বেও হয়তো গুরুভাগ্যে ঘুরে যাবে অদৃষ্টের চাকা।

ইংরেজ প্রভুর নেত্রে সর্ষে ফুল? আমাদের হাতে আসবে রাজ্যভার

চমৎকার কি বা! ধনীদের তো পোয়া বারো।”<sup>৪০</sup>

‘মিলির হাতে স্টেনগান’ গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচক মোস্তফা মোহাম্মদ জানিয়েছেন—“বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুদ্ধ ফেরত এক মুক্তিযোদ্ধার কাছে কাঙ্ক্ষিত স্বদেশের রূপ যে-রকম সাজানো ছিল, যে-রকম স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছিল তার কিছুই পায়নি কেউ। এমনি এক মুক্তিযোদ্ধার কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘মিলির হাতে স্টেনগান’।”<sup>৪১</sup> তবে সত্যিই গল্পে আমরা আব্বাস পাগলার মুখ দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের আশাভঙ্গের ফিরিস্তি শুনতে পাই। যে মিলির পিতা আশরাফ আলী বেপথু রানাদের অবৈধ উত্থানের জন্য ত্রুণ সংলাপ বর্ষণ করেছে; সেই আব্বাস পাগলা সুস্থ হলে নীতি আদর্শ যুদ্ধের কথা আর মনে রাখতে চায় না এবং মিলির পিতার দলেই ভিড়ে যায়। মিলি পি.জি হাসপাতাল থেকে ফিরে আসা আব্বাস পাগলার হাতে কাঙ্ক্ষিত দু’হাতে শিশুর মতো করে শোয়ানো স্টেনগান এগিয়ে ধরলে আব্বাস পাগলার ফিটফাট বুলে পড়া একরঙ্গা মুখ বলে—“মিলি আমি না ভালো হইয়া গেছি। তুমি বোঝো না? আমার ব্যারাম ভালো হইয়া গেছে।”<sup>৪২</sup> গভীর ব্যঙ্গোক্তি শোনা যায় গল্পকারের কণ্ঠে—“স্বাধীনতার মহান চেতনা ভুলুণ্ডিত হয় নয়া শাসক ও শোষিতের আবির্ভাবে। এরকম দম বন্ধ করা অবস্থায় মুক্তি যোদ্ধা আব্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও তার স্বাভাবিকতা হারায়। বাতুলগ্রস্থ মনে হয় নিজেকে।”<sup>৪৩</sup> এরকম গল্প পটভূমি থেকে আমাদের সহজেই মনে আসে—“এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা, বোধ আর অনুভূতির এলাকায় যতটা সৃজন শীলতার প্রকাশ ঘটেছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের ব্যবহারিক জীবন তা উৎপাদন ব্যবস্থায় তার ছাপ তেমন পড়েনি।”<sup>৪৪</sup> এই না পাওয়ার বেদনা যেন আমাদের সেই উৎস ভূমিরই সাংকেতিক ইঙ্গিত প্রদান করে।

‘দোজখের ওম’ (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯) গল্প গ্রন্থের ‘অপঘাত’ গল্পে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধকালে কোন একদিনের একটি গ্রামের একটি পরিবারের কাহিনী দেখতে পাই। মৃত্যুর

ন্যায্যতা নিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় গল্পে। এর জন্য লেখককে কোনো ব্যাখ্যা দিতে হয়নি। গল্প নিজে নিজেই বুলুর মৃত্যুকে দেয় মর্যাদা। মোবারকের পুত্র বুলু কীভাবে মারা গেছে তা মোবারক জানে না। মৃত্যু সংবাদে নিজেদের জীবন তাগিদে, পাকসেনার ভয়ে বুলুর মাকে পুত্রশোকে কাঁদতেও বারণ করে পিতা মোবারক আলি। কিন্তু পরে দেখা যায় চেয়ারম্যানের ছেলে শাজাহানের রোগের মৃত্যুর চেয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে পাঁচটি সেনাকে হত্যার পর যে মৃত্যু হয় তা অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করেছেন বুলুর পিতা-মাতা। মোবারক জানেন তার ছেলের লাশ ডোবার জল ছাপিয়ে যমুনায় ভেসে উঠবে। এই বিশাল জল ধারায় তার রোগা ঢাঙা কালো ছেলেটার গুলিতে বাঁঝরা বুক কানায় কানায় ভরে গিয়েছে। এই গুমোট গরমে সিন্দুকের মতো গর্তে মাটি চাপা হয়ে থাকতে হচ্ছে না বলে বুলু তার ইচ্ছে মত হাত-পা ছড়াতে পারে। তাই সকালবেলা যে মোবারক প্রাণভয়ে তার স্ত্রীকে কাঁদতে না বলে, রাতে এসে সে চায় তার স্ত্রী জোরে কাঁদুক আর সবাইকে জানাক তার ছেলে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ। একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তি যুদ্ধ ভিত্তিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন এবং তা বিপুল বিশাল জনগণের দীর্ঘ সংগ্রাম ও বিপুল আত্মত্যাগে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন, এটাই পূর্ব বাংলার বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব গাঁথা। মোবারক আলি সবাইকে উচ্চস্বরে জানিয়ে দেয় তার ছেলে অপঘাতে নয়, মহান মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সে যমুনায় মিশেছে। পেয়েছে সে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা।

“... বুক গুলি লেগে বুলু মারা গেছে। না, এমনি মার খেয়ে  
মরেনি, মরার আগে হাত দিয়ে বোমা ছুড়ে মটোর ভর্তি মিলিটারি  
নিশ্চিহ্ন করে তাদের গাড়িগুলি সব উল্টিয়ে তারপর—।”<sup>৪৫</sup>

যুদ্ধে বুক চিতিয়ে গুলি খেয়ে এই মৃত্যু যেন মুক্ত প্রাণা মধ্যবিত্তের এক আত্মশ্লাঘা। মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া সমাজকে শোষণ করে ঠিকই কিন্তু আবার দেশ রক্ষায় বুক চিতিয়ে গুলি খেতেও পিছু পা হয় না, বুলুর মত মধ্যবিত্ত প্রাণ তার প্রমাণ দান করে।

‘জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল’ (১৯৯৭) গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত ‘ফোঁড়া’ (১৯৮০) গল্পটি সমকালীন বাংলাদেশের সমাজজীবনের ও রাজনৈতিক জীবনের ফোঁড়াকে তুলে ধরতে চেয়েছে আমাদের সামনে। কারিগর ইলিয়াস সাহেব দিন আনা দিন খাওয়া মানুষকে গল্পের মূল স্তরে দাঁড় করিয়ে পরোক্ষ রাজনৈতিক উল্লাষিকতার চিত্রকে এখানে তুলে ধরার কঠিন প্রয়াস করেছেন।

রাজনৈতিক দলের নেতা মামুন গরীব নইমুদ্দিনকে টাকা দেয়, কারণ তাদের দলের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য। কিন্তু টাকা পেয়ে নইমুদ্দিন চলে যায় বাড়ি; ঈদের উৎসব করতে শারীরিক অসুস্থতাকে পেড়িয়ে। মামুন রিক্সায় ফিরতে ফিরতে রিক্সাওয়ালার দুঃখের গল্প শোনে। রিক্সাওয়ালার তার গজিয়ে ওঠা ফোঁড়া দেখানোর চেষ্টা করলে রিক্সা উণ্টে যায়। মামুন শরীর বাঁচাতে রিক্সা চালকের গায়ে পা দিয়ে কাদা বাঁচিয়ে ডাঙায় ওঠে। ভাড়া মিটিয়ে ঘরে যায় মামুন কারণ এসব নিম্নবিত্তের লোকেদের সঙ্গে কথা বললে তার চলবে না, তার অনেক কাজ হামিদ ভাইয়ের সঙ্গে। মামুন এখন রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি, সমাজের নানান সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত। বাস্তবিক রাজনৈতিক কর্মী কিনা এই প্রশ্ন গল্পকার ইলিয়াস সাহেব আলোচ্য গল্পে মামুন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে রেখে গল্পের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। যা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হবার কথা নয়।

“... ক্ষুধার অনল চির লেলিহান জ্বলে অশান্ত বায়,  
সংগ্রাম জাগে মানুষের পায় পায়!  
জাগে স্বার্থের খর শর নিক্ষেপ,  
কৌটিল্যের অকুণ্ঠ অভিনয় আর চাতুরী লজ্জাহীন,  
হেথা জাগ্রত হৃদয় মৃত্যুলীন।”<sup>৪৬</sup>

মানুষের পায়ে পায়ে সংগ্রাম জেগে ওঠে রাজনীতির কুচক্রকে বদলাবার জন্য, কিন্তু সময়ের শাসনযন্ত্র অবিকল থাকে। মার্কস, এঙ্গেলস্ প্রভৃতি সমাজতত্ত্ববিদদের চিন্তিত দর্শন কাগজ পৃষ্ঠায় দম আটকে থাকে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আলোচ্য গল্প সাহিত্যে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক বয়ান ‘বাঙালি’ না ‘মুসলমান’ কোনটা সবচেয়ে বেশি পরিচিতি বাঙালি মুসলমানের কাছে; তার সূত্র ধরেই যেন ’৫২ থেকে ’৭১ -এ উত্তরণ দেখিয়েছেন। কিন্তু অবশেষে জয় হয় ‘জয় বাংলার’। কিন্তু তবুও আজও মৌলবাদ ও পুঁজিবাদের অসম বিকাশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দিন কাটায় ‘দুধভাতে উৎপাত’ এর মধ্যদিয়ে। আর কিছু সংখ্যক লোক ‘উৎসবে’। নিজেদের হাতে ’৭১ এর দেশ থাকা সত্ত্বেও এখনও দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তাই অনেককেই বলতে দেখা যায়—আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম? ইলিয়াস সাহেব এই প্রশ্ন মাথায় নিয়েই নিজস্ব কলমে সমাজ রাজনীতিতে ঘুরে ঘুরে অবস্থার সম্মুখীন হয়ে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত মানুষের প্রকৃত অবস্থান আমাদের সামনে বে-আব্র

করে প্রকাশ করেছেন।

গ. গল্পে সমাজভাবনা-দ্বন্দ্বিকময় জীবনচিত্র ও বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ :

ইউরোপে পুঁজিবাদ সামন্তবাদকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে এগিয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানে-ভারতে এবং বাংলাদেশে তেমনটি ঘটেনি। বিশেষ করে পাকিস্তানে দেখা যায় সেখানকার পুঁজিবাদ বাইরের পৃথিবীকে জয় করতে বের হয়নি, চেষ্টা করেছে ভেতরে যা আছে সেটাই ভোগ করতে। এর কারণ পুঁজি সেখানে স্বাধীন নয় এবং বুর্জোয়ারা হয়ে উঠতে পারেনি যথার্থ বুর্জোয়া তারা হতে পারেনি বহিমুখী, অন্তর্মুখী-ই রয়ে গেছে। তারা লালন করে অন্ধকার। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশেও ঘটে চলে এমন ঘটনাই।<sup>৪৭</sup> ধনতন্ত্রের আঁচল ধরে বেড়ে ওঠার কারণে ব্যক্তিজীবন আজ অবরুদ্ধ। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'state' ব্যক্তিকে কিছুই দেবে না কিন্তু সব ব্যাপারে গলাবে নাক।<sup>৪৮</sup> কাঞ্চন কৌলিন্যে বিত্তের প্রতি বাড়তে থাকে মানুষের আগ্রহ, নৈতিকতা, মানবিকতা-সমাজ থেকে যায় উবে। ক্রমাগত বাড়তে থাকে হতাশা, নৈরাশ্য, অবক্ষয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও মধ্যবিত্তের ব্যক্তি নির্ভর রাজনীতি, অবক্ষয়িত গ্রাম্যজীবন, উচ্চবিত্তদের কাঞ্চন কৌলিন্যের দাপট, হিন্দুদের 'Minority' সমস্যা— ইত্যাদি আজও অব্যাহত। তাই স্বাধীনতার পরও লিখতে হয় 'বাংলাদেশ পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়' - আর বাড়তে থাকে সমাজে জীবনের জটিলতা।

“১৯৪৭ পূর্ববর্তীকালে গ্রামজীবন থেকে মধ্যবিত্তের উত্থান এবং ১৯৪৭-৫৭ কাল পর্বে চলেছে তাদের গ্রামীণ খোলস পরিবর্তন। এ সময়ে গল্পকারগণ কাহিনী বর্ণনায় যতটা নিবেদিত, মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র নির্মাণে ততটা মনোযোগী ছিলেন না। ১৯৫৮-৭১ সময় পরিসরে বহুবিধ সংঘাত, সংঘর্ষ ও কালিক বৈরিতায় মধ্যবিত্ত হয়ে উঠেছে সচেতন শ্রেণীবদ্ধ। আত্মসচেতন মধ্যবিত্ত জীবন রূপায়নে এ সময়ে গল্পকাররা হয়েছেন সক্রিয়, সচেতন। ১৯৭২-৮১ কালপর্বে মধ্যবিত্ত জীবন উপস্থাপনায় গল্পকারদের দক্ষতা ও বীক্ষণ ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮২-৯০ পর্বে মধ্যবিত্ত জীবনের সূক্ষ্মতর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সমূহ ছোটগল্পের

অবয়ব নির্মাণ করেছে এবং তা হয়ে উঠেছে সাফল্যস্পর্শী।”<sup>৪৯</sup>

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালিক পর্বে বাংলার মধ্যবিত্ত মুসলমান বাঙালি সমাজের জীবন জটিলতার দ্বন্দ্বিকময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়কে খুব কাছ থেকে পরোখ করে তারপর তাদের গল্পে তুলে ধরেছেন। ১৯৪৭-৯৫ এই সময়কালের সামগ্রিক কালিক ভাবনা বহিঃপ্রকাশ তাঁর ‘৫’ খানি গল্পগ্রন্থে। সমাজ, সমাজের নিয়মে চললেও তার রশি মধ্যবিত্তের হাত বদ্ধ। 'Expert' বুর্জোয়া সমাজ, সমাজ চালানোর ভার নিজের কাধে তুলে নেয় নিজেদের স্বার্থ পূরণের তাগিদে, আর তাই তাদের জীবন জটিলতা আর সকলের থেকে একটু বেশি। ইলিয়াসের রচনায় বাংলাদেশের সমাজ প্রথাগত, প্রযুক্তি অনগ্রসর ও অজ্ঞ, ক্ষুধার্ত দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত দেশের রাজনীতি-অর্থনীতির জীবনলেখ্য অত্যন্ত সাবলীলভাবে ধরা পরেছে। ‘নিরঙ্কশ যাত্রা’ গল্পটি যার চরমতা প্রকাশ করেছে। গল্পে রঞ্জুর যে বিকারগ্রস্ততা তা অনেকটা নাগরিক সংক্ষুব্ধতায় উদ্ভাসিত, লেখক নিজেই বলেন—“গল্পটায় ছেলেটার যে Problem সেটা অনেকটা একরৈখিক। গল্পটা বেশ রোমান্টিক; ছেলেটার যে একধরনের আত্মহত্যা সেটাও খুব মিষ্টি করে দেখানো হয়েছে।”<sup>৫০</sup> গল্পে রঞ্জুর আত্ম অনুসন্ধানী ভাব কিংবা অতীতকে খোঁজার প্রবণতা, বাস্তবতার সংক্ষুব্ধ থেকেই উৎসারিত হয়। রঞ্জু প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ইলিয়াস জানান—

“...ওসমান শুরু থেকেই রঞ্জুর মধ্যে তার ছেলেবেলাটা দেখতে পায়, তার প্রতি অন্যরকম একটা ভালোবাসা অনুভব করে। এটাকে নার্সিসিজম বলতে পারো। মধ্যবিত্ত মানুষেরা কিন্তু basically নার্সিসিস্ট। তারা নিজেকে নিয়ে অতীতকে নিয়ে থাকতে ভালোবাসে।”<sup>৫১</sup>

অসংবদ্ধ জরাগ্রস্ত সামাজিক যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে কখনো নিশ্চিত পুরের মাঠ, কখনো পুকুরের ধারে নেবুর তলে মর্মরিত গন্ধ অনুভব করে। সেখানে সে ফিরে যেতে চায়। কৌশরে কোলাহলের সঙ্গীদের কাছে পেতে চায় ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে ফেলে আসা দিনগুলোকে, দামাল প্রকৃতির ঝাপটায় বৃষ্টির সাথে মেলাতে চায় নিজেকে। গভীর রাত্রিতে নিঘূর্ম রঞ্জু মা’কে বাবাকে যেন ফেলে এসেছে—এই অ্যাবসার্ড প্রশ্নের মাধ্যমেই সে টেলে দেয় নগরের ক্রোধ। ইলিয়াস বাস্তবের ভিতরে অবগাহন করেছেন, রঞ্জুর গোপন মনঃতল স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন। এই স্পর্শানুভূতির জন্যই তিনি পরাবাস্তব ভাবনায় হয়েছেন

আপ্লুত।

‘প্রতিশোধ’ গল্পে পাত্রপাত্রী বা মধ্যবিত্ত চরিত্র। এ পটভূমিকা হল মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ। একটি সফল যুদ্ধের পরও স্থিতিশীলতা নেই দেশে। নানাভাবে স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতায় ব্যস্ত সবাই। আমার শাসক বদলালেও শোষণ বদলায়নি। অব্যবস্থা অসম অর্থনীতি বন্টন বিভিন্ন চরিত্রকে করে তুলেছে সন্দেহ প্রবল। ও অবিশ্বাসী মনোভাবাপন্ন। বঙ্গত দেশের দোষ নয়, দেশের মানুষেরও নয়; দোষ হচ্ছে ব্যবস্থার যে ব্যবস্থা পাকিস্তান আমলে ছিল সেটি ছিন্ন করে আমরা বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। সেজন্যই তো মুক্তিযুদ্ধে, কিন্তু দেখা গেল অনেক কিছু ঘটলো বটে, কিন্তু ব্যবস্থাটা বদলানো না। ওসমান তার বাবা ও ভাই সবাই বৈষয়িক মানুষ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত। তাই বোনের হত্যার ও প্রেমিকা হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে আবুল হাশেমকে না মেরে হ্যালুসিয়েশনে মেরে ফেলে নিজেই। কারণ তার মধ্যেও তো স্বার্থ জিনিসটা করে কাজ। তাইতো ওসমানের হাত কেবল ‘উঠবো উঠবো করে’ কিন্তু পরক্ষণেই ‘বুদ্ধিমানের মত ওসমান হাতটা পকেটে রেখে দিল। রাখা ছাড়া উপায় থাকেনা ওসমানের কারণ ভাইয়ের টেঙারের কাজটা সেই পাইয়ে দেবে। নগরজীবনের জটিলতায়। সমাজে যেন-তেন প্রকারেণটিকে থাকার প্রবণতায় মধ্যবিত্তের ন্যায় অব্যায় বোধের দ্বন্দ্বটুকুও মুছে যায়। বাড়তে থাকে জীবন জটিলতা।

‘ফেরারী’ গল্পে নগরজীবনের আলেখ্য এসেছে ‘urban mentality’ নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ফেরারী গল্পে ঢাকা শহর, তাদের দীর্ঘদিনের জীবনচর্চা গল্পটির প্রধান উপজীব্য। মৃত্যু সজ্জায় সজ্জিত ইব্রাহিম ওস্তাগর তাকে ঘিরেই গল্পের মূল বিষয়। ফেরারী গল্পে ইব্রাহিম ওস্তাগরের পূর্ণাঙ্গ জীবনের সাথে তার প্রজন্মের অপরাধ প্রবণ থাপিত জীবন এসেছে। ডামলালু এবং তার মস্তান বাহিনীর আইন শৃঙ্খল রক্ষাকারীদের ফাঁকি দিয়ে স্থূল জীবন যাপন করে ডামলালুরা নিজেদের অপরাধবোধের প্রায় ছাত্রদের হীনমন্যতার দিকে তাকিয়ে যে ছাত্র সমাজ একদিন নেতৃত্ব দেয় ’৫২ -এর ভাষান্দোলন থেকে ’৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধ-এ তাদের বর্তমান রূপ ফুটে ওঠে হানিফের মস্তব্যের প্রেক্ষিতে ডামলালুর বক্তব্যে—‘ইসটুডেন হালারা হালারা কি করবো তুমি জানোনা, না? কেলাব থাইকা, হোটেল থাইকা সাহেবরা বারাইবা মালটাইনা, অরা হেই গাড়িগুলো ধইরা মালপানি ক্ষমায় মাগীউগি পছন্দ হইলে ময়দানের মইদ্যে লইয়া হেইগুলিরে লাগায়। অহন বুঝলি হলায় বস্তিচোদা বুঝলি? দিন

তো হালায় ইসটুডেন গো, হালায় ইসটুডেনের মারে বাপ।”<sup>৫২</sup>

‘মিলির হাতে স্টেনগান’ এরকমই আরেকটি গল্প। এ গল্পে আশরাফ আলির মস্তান পুত্র রানা ও সহযোগীদের চরিত্র এসেছে, আমরা যা আলির ছেলের কীর্তি দেখলেও বোধহীন; কারণ রানা ও তার সহযোগীদের ভিত্তি আছে সমাজে। সমাজে নায়ক এলিট শ্রেণি এদের পোষক, নিয়ন্ত্রক। পাশ্চাত্য কালচার এদের আদর্শ। যে কোন পন্থায় ভাগ্য পরিবর্তনে বিশ্বাসী এরা আমাদের এখানে সচেতন ও সংগঠিত সংস্কৃতি চর্চা প্রচলিত কেবল মধ্যবিত্তের মধ্যেই। আজ মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। ‘মিলির হাতে স্টেনগান’ গল্পে গৃহিনী সোনোয়ারা বেগম রানার যাচ্ছে তাই কার্যকলাপে সন্তুষ্ট। মেয়ে মিলির বিয়ের জন্য যে খোঁজে বিত্তশালী বর। দেশত্ববোধ, সৎ ও নিষ্ঠবান মানুষের গ্রহণযোগ্যতা নেই তার নিকট। মনে পড়ে ‘সখবার একাদশী’ গল্পে নিমচাঁদ চরিত্রের কথা বলে—“কলিকাতার লোক স্বর্ণ ঘুরে গর্দভকে কন্যাদান করবে তবু সদগুণ বিশিষ্ট বিষয়হীনকে সুপাত্রকে মেয়ে দেবে না...”<sup>৫৩</sup> আধুনিক সমাজে টাকাই করে মান বিচার। গল্পটিতে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছে মুক্তিযোদ্ধা পাগল আব্বাস পাগলার হাত ধরে। কিন্তু আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় তারাও ঠিক হয়ে রানার কাছেই আসে সুপারিশ নিয়ে স্বচ্ছল জীবন যাপনের জন্য।

‘যুগলবন্দি’ গল্পে আসগর ও আরগস চরিত্রের সাদৃশ্য নির্মাণ করেন লেখক আগ্রাসী পুঁজিবাদের প্রতি ল্যেগন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। ব্যক্তি সর্বস্ব মানুষের স্বার্থসিদ্ধির জীবনরীতির প্রতি কটাক্ষপাত করে তিনি তাদের মানবেতর যাপিত জীবনের সাথে মিলিয়ে দেয়। বি.এ পাস আসগরের পরিবারের মা-বাবা, ভাই-বোন আছে। তার সম্পর্কিত এক ভাই সিকানদারকে সাগেয়ার সাহেব চাকুরি দেবার পর আসগর সেই স্থানে আসে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাহেবের মনোরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাই শেষে আসগর ও আরগসের মধ্যে থাকে না তফাৎ। “আসগর সিগ্রেটে কয়েকটা সুখটান দেয় আর অনুভব করে সে আরগস খুব আরাম ও তৃপ্তির সঙ্গে বাউয়েলস্ ক্লিয়ার করছে। শিকলের ধাতব বুননি বেয়ে সেই তৃপ্তি আসগরের শরীরে চমৎকার মৌতাত ছড়িয়ে দিচ্ছে।”<sup>৫৪</sup>

‘জাল স্বপ্ন, স্বপ্ন জাল’ গল্পে দেখা যায় রাজাকার নজির আলি সমাজে এখন খুব প্রতিষ্ঠিত। অথচ মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দিনের বংশধর বুলেট ও তার অধীনেই থাকে। মুক্তিযুদ্ধ যা চেয়েছিল কিছুটা হয়ত পেয়েছে কিন্তু সমাজ এখনও থেকে গেছে উণ্টো হাটা লোকেদের কাছে।

লালমিয়া জীবনের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের মাঝে জীবন জটিলতাকে ইলিয়াস দেখায় খুব কাছ থেকে।

‘কাল্প’ গল্পে দেখি আরেক জীবন জটিলতার কথা যেখানে মৃত ছেলের লোক থেকে বড় হয়ে ওঠে ঋণশোধের ব্যাপারটি। আবেগ, মায়া থেকেও খুব জরুরি হয়ে ওঠে আফাজ আলির শবের রাতে উপার্জন করার চিন্তা। বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় এই ভাবেই সম্পর্কগুলো পলকা সুতোয় বাধা। পেটের টানে মনকেও করতে হয় নির্মম বাস্তবতার চিন্তা।

‘মাটি জল বায়ু অগ্নি এবং মানুষ  
ভারতবর্ষ তোমাকে প্রণাম করেই  
সেই ইতিহাসে কোণঠাসা নারী আমরা  
শুরু করলাম কথামানবীর ভাষ্য’

— মল্লিকা সেনগুপ্ত<sup>৬৬</sup>

ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর যে কোনো দেশের ইতিহাসেই নারীরা দীর্ঘ সময় ধরে হয়েছে উপেক্ষিত, নির্বাসিত। অসভ্য যুগে যৌথ বিবাহ (Group Marriage), বর্বর যুগে জোড় পরিবার (Pairing Marriage) এবং সভ্য যুগে একনিষ্ঠ বিবাহ (Monogamy) পদ্ধতির মাধ্যমে যেভাবে সমাজ রূপ পায় মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতায় ও সামাজিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানসিক চিন্তা ধারা থেকে নারীরা বঞ্চিত হয়ে স্থান পায় রান্নাঘর ও আঁতুড় ঘরের একঘেয়ে দাসত্বজীবনে। সেই দাসত্বজীবন প্রথম প্রশ্নের সম্মুখীন হয় শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে। কারণ এই প্রথম নারীরা অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে।<sup>৬৭</sup> সেইসময় যে বইগুলি লেখা হয় 'Declaration of the Rights of Women' (Olympe de Gouges : 1791) ও 'Vindication of the Rights of Women' (Mary Wollstone Craft : 1792) - বইগুলিতে প্রতিবাদের কারণ ছিল অধিক কায়িক শ্রম করে পুরুষদের তুলনায় কম বেতন পাওয়ার ক্ষোভ আর সরকারের চোখে, আইনের চোখে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের সমান অধিকারের দাবী।<sup>৬৮</sup> আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু নারী মুক্তি কথাটি নিয়ে আসেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু জ্ঞানার্বেষী ব্যক্তির। আমাদের দেশে নারীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে লড়াই করেছেন আরও কিছুদিন পরে। কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বেগম রোকেয়া প্রভৃতি মণীষী নারীদের কথা উল্লেখ করেও বলা যেতে পারে ভারতবর্ষে দুই বিশ্বযুদ্ধের টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের

দিনগুলিতে ভারতবর্ষের নারীরা নিজেরা নিজেদের বাঁচাতে শেখে, ঘরের অন্তঃপুর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিছু বুভুক্ষু পুরুষের চোখে নারী কিন্তু শরীর ছাড়া আর কিছু নয়, তাই দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩) দাঙ্গা (১৯৪৬) দেশভাগ (১৯৪৭) ঘটনা যাইহোক না কেন সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত, ধর্ষিত, আহত হতে হয় নারীদের। তবু হার না মানা নারীরা '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে চলে, '৬৯-এর গণ আন্দোলন কি নারীদের ছাড়া এমন বড় 'গণ' হতে পারত? আবার '৭১-এ চরম নির্যাতিত হতে হতে এই নারীরাই শেখে মড়া থেকে মারা। এ বিদ্রোহ অন্তহীন কেননা আধুনিকতার আভরণে সমাজ আবার সেই নারীদের পড়ায় শৃঙ্খল। যেমন নারীরা শিক্ষিত হয়েছে কত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে সেই শিক্ষিত নারীদের 'শিক্ষা' আজ বিয়ের একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণে কি দাঁড়ায়নি?

বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলি সেই কথাই কিন্তু বলে। তবে কিছু কিছু পুরুষেরা যেমন নারী মুক্তির পথে বাঁধা তেমনি কিছু কিছু নারীরাও—সংস্কারের দ্বন্দ্ব, বিজ্ঞাপনের চমক প্রলোভনে কিছু নারীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে পৌঁছে যায় ব্যক্তিসর্বস্বতায়। সেখানে পোশাকে হয়ত আধুনিকতা আসে কিন্তু মননে নয়।

“আসলে সেই পুরোনো তড়েই ফিরে যেতে হয় - সমাজ বদল।  
এর কোনও বিকল্প নেই। কী বর্জন করবে, কে বর্জন করবে,  
কেন বর্জন করবে এ বিষয়ে পরিস্কার ধারণা না জন্মালে কেবল  
পোশাকই বর্জিত হবে, ঘুণে ধরা পুরোনো সংস্কারগুলো লেপটে  
থাকবে সারা গায়ে। ওগুলো বর্জন করতে জ্ঞান, চিন্তা শক্তি  
দরকার হয়, ওটা হেয়ার রিমুভারে হয় না।”<sup>৫৮</sup>

আর তাই—

“জিনসের প্যান্ট, স্কিন টাইট টপ অথবা মিনিজ এবং টিশার্ট  
পরিহিতারা আধুনিক সাজে সজ্জিত হয়ে, আটশ টাকার জুতো,  
বারোশ টাকার অত্যাধুনিক বিদেশি সানগ্লাস পরে ঘটিতে দুধ  
নিয়ে গণেশকে খাওয়াতে ছোট।”<sup>৫৯</sup>

ছোটগল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস শুধু বাংলাদেশেরই একজন শ্রেষ্ঠ অন্যতম গল্পকার নন, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও তিনি সমাদৃত। তাঁর নির্মম কৌতুকবহু বাচনভঙ্গী, সরস নির্মোহ

ভাব লেখনীর ক্ষেত্রে তাঁকে অনন্য করে তোলে। তিনি তাঁর গল্পের বয়ানে ব্যবহার করেন পর্যাপ্ত ডিটেলস, তাই দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন স্বপ্নের জগৎ, কুসংস্কার, যৌন জীবনযাপন এবং প্রায় সবকিছুই, তিনি সাহিত্যে জুড়েন। সেখানে বাদ যায় না প্রতিদিনের ব্যবহৃত তথাকথিত অল্লীল ভাষাও। যার ফলে বাংলাদেশের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ গল্পকার থেকে তাঁকে আলাদা করে চিনে নিতে আমাদের কোন অসুবিধে হয় না।

ইলিয়াস বাস্তবধর্মী লেখক তিনি বাস্তবকে যেমনটি দেখেছেন তেমনটি (বাইরে ভিতরে) তাঁর কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য বাস্তব ছাড়া নয়, বাস্তব মানব সম্পদ ছাড়া নয় আর মানব সম্পদে নারী-পুরুষ দু'জনেই অংশী। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত মূলত চারটি—

- ক. স্বামী-স্ত্রী
- খ. মা-ছেলে
- গ. বাবা-মেয়ে
- ঘ. ভাই-বোন

ইলিয়াসের ছোটগল্পগুলি থেকে নারীর মাতৃত্বের দিক, ফ্রেয়েডিয়ান যৌনতার দিক, মুক্তি যুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসের দিক, গ্রামে প্রতারণিত নারী, লোভাতুর নারী—ভালো খারাপ নির্বিশেষে সবকিছুই ফুটে ওঠে। এক নির্বিকারত্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

“আমি (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস) নির্দিষ্ট কোনো Philosophy মাথায় রেখে reality দেখি না। Reality -কে আমি ভেতর থেকে দেখতে চাই। কিন্তু আমি তো Journalist না, reality মানে যা আমি দেখতে পাচ্ছি কেবল তাই নয় -এর ভেতরকার স্বপ্ন সাধ সংকল্প সংস্কার কুসংস্কার সবই reality-র ভেতরকার Reality।”<sup>৩০</sup>

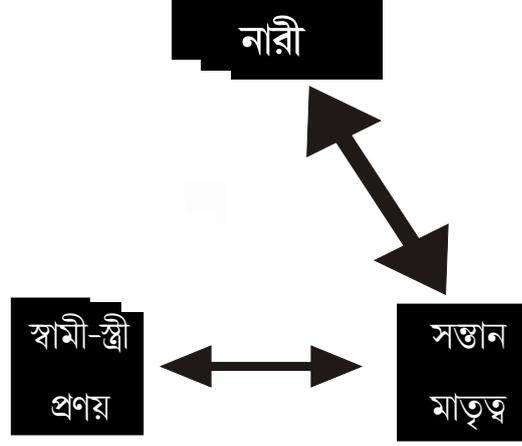
ইলিয়াসের ‘যোগাযোগ’ (গল্পগ্রন্থ - ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’, মে, ১৯৭৬) গল্পটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রচিত হলেও এটি একটি বিশ্বজনীন সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। মাতা ও সন্তান -এর মধ্যে সন্তান বড় হবার সাথে সাথে সম্পর্কের যে ব্যবধান বাড়তে থাকে ‘যোগাযোগ’ সেই সমস্যার গল্প হয়ে ওঠে। রোকেয়া তার খোকন কে রেখে যায় বাপের বাড়ি অনেকদিন পর

সেখানে গিয়ে সে হারিয়ে যায় শৈশব স্মৃতি মধুরতায়, কিন্তু খোকনের ঘটে বিপত্তি, সে দোতলার কার্নিশ থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছে। রোকেয়া ভাবছে তার সন্তানের এই বিপত্তি তার বাড়িতে না থাকার দরুণ। আবার এও ভাবছে যে তার খোকন যদি তাকে দেখে তাহলে তার সব ব্যথার উপশম হবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। হাসপাতালে রোকেয়া গেলেও ‘রোকেয়ার হাতের তালুর নিচে খোকনের জ্বরের তাপ বাড়ে শুধু।’<sup>৬১</sup> লেখক নিজের গল্প সম্পর্কে জানান আমাদের—

“আমি বলতে চাইছিলাম একজন মা - with her all affection, motherhood, বাৎসল্য একটা পর্যায়ে ছেলের সব কষ্ট লাঘব করতে পারে না। রোকেয়া ছেলের অসুস্থতার কথা শুনে ফিরেছে। ... সে যখন ছেলের কাছে পৌঁছাচ্ছে তখন তার গাঁয়ে ১০৩° জ্বর কম্বলের মত জড়িয়ে। রোকেয়া হাত দিচ্ছে কিন্তু সে-হাত ঐ কম্বল ভেদ করে ছেলের কণ্ঠের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। ... ছেলে যখন বড় হতে থাকে মায়ের সাথে এক পর্যায়ে আর যোগাযোগ ঘটে না। যে মায়ের উপর তুমি দারুণ dependent ছিলে একসময়, এক পর্যায়ে তার সাথে তোমার সব কণ্ঠের আর যোগাযোগ ঘটছে না। তুমি তোমার সব Problem আর share করতে পারছ না। হয়তো তোমার প্রেমের সমস্যা বা কোনো philosophical crisis দুজনের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা হয় না, এটা দুজনের জন্য খুব বেদনাদায়ক। তবু এটাই সত্য।”<sup>৬২</sup>

এই ঘটনা গল্পে যে রোকেয়া ও তার খোকনের মধ্যে হয়েছে তা নয়, এটা হয়েছে স্ত্রী হারানো সোলায়মান আলী ( রোকেয়ার বাবা) আর রোকেয়ার মধ্যেও। খোকনের খবর শোনার পর ট্রেনে বিরতিহীন রোকেয়ার কান্না দেখে সোলায়মান আলীর মনে হয়—‘এতো আদর এতো ভালোবাসা ওর কষ্ট কি একটুও কমে না?’ (‘যোগাযোগ’, পৃ. ৫৪)। এ গল্পের যে সমস্যা তা অনেক পুরোনো। যে কারণে কার্তিক ঠাকুরের সাথে উমার বিয়ে হয়নি, ও কার্তিক চিরকুমার। কারণটি মা দুর্গার অভিমান, পাছে বৌ আসলে মায়ের আদর কমে। কিন্তু দেখবার বিষয়

বিবাহ নামক ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীকে, যে চাকুরীরতা নয়, তাকে সর্বদা সময়ের ব্যবহার করতে হয় সংসারে। এই সংসারে তাদের সর্বাধিক অধিকার ফুটে ওঠে দুটি সম্পর্কের মাধ্যমে—



এই নারীর প্রণয়ী ও মাতৃত্বের দ্বন্দ্বের চরম অভিঘাত লক্ষ করি আমরা বনফুলের (১৮৯৯-১৯৭৯) ‘বুধনী’ গল্পের মাধ্যমে। তাহলে যে নারীর এতটা সময় পার হয় ‘মাতৃত্ব’ সম্পর্কের মাধ্যমে তার অধিকার হঠাৎ করে অন্য কেউ যখন নেয় তখন দ্বন্দ্ব অবশ্যপ্তাবী। সুতরাং শাশুড়ি ও বৌ-এর সম্পর্কের এই গুপ্ত টানাপোড়েন শুধুমাত্র নারী সম্পর্কের মিথ বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তার ভুল-ভ্রান্তি খুঁজতে হবে আমাদের গভীর সামাজিক সম্পর্কের মানসিক টানাপোড়েন গুলিতেই। না হলে ‘চোখের বালি’ (১৯০৪) উপন্যাসের মত সংসারের সমস্ত সম্পর্কের টানাপোড়েনের দোষ ‘মাতৃঈর্ষ্যা’র উপর পড়তে বাধ্য, আজও। এও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর চরিত্রের চরম অবমাননা ছাড়া আর কি?

ইলিয়াসের সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ সালে প্রকাশিত ‘খোঁয়ারি’ গল্পগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল ‘তারাবিবির মরদ পোলা’। এটি একটি ফ্রয়েডিয়ান যৌন মনস্তত্ত্বের গল্প। রমজানের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তারাবিবি। বয়সের ব্যবধানের দরুণ তারাবিবির দাম্পত্য স্বাদ কিছুটা তিক্ত—‘তুমি (রমজান) তো একখান মরা মানুষ! তামামটা জিন্দেগী ভইরা খালি বিছানার মইদ্যেই পইড়া রইছ, একটা দিন বুঝবার পারলা না আমি ক্যামনে কি পেরেশানির মইদ্যে ঘরবাড়ি চালাই।’ (‘তারাবিবির মরদ পোলা, পৃ. ১৩৪) আর সেই কারণে তারাবিবি তার ছেলে গোলজারকে অহেতুক সন্দেহ করে। এবং গোলজার ও তার স্ত্রী সখিনার মধ্যে সর্বদা লড়াই বাধানোর চেষ্টা করে। কিন্তু যেদিন সত্যি গোলজার পরকীয়ায় যায় সেদিন এই তারাবিবি-ই বলে তার

স্বামীকে— ‘পোলায় আমার জুয়ান মরদ না একখান? তুমি বুইড়া মড়াটা, হান্দাইয়া গেছো কবরের মইদ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝবা ক্যামনে?’ (‘তারাভিবির মরদ পোলা’, পৃ. ১৪৭) তারাভিবির মধ্যে দ্বন্দ্ব এভাবেই কাজ করে। তারাভিবির এই দ্বন্দ্ব দুটি সম্ভাব্য কারণ দিয়ে দেখা যেতে পারে—

এক। তারাভিবি নিজের অদম্য ইচ্ছে (id) সারাসরি পূরণ করতে পারছে না, সামাজিক বিধিনিষেধের (Ego, Super ego) জন্য তাই সেটি সে পূরণ করতে চাইছে অন্য পথে, পুত্র গোলজারের হাত ধরে।

দুই। যেহেতু তারাভিবি নিজের দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়, তাই তার পাশাপাশি নিজের ছেলের সুখী গৃহকোণ তার চোখে জ্বালা ধরাবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

তারাভিবির এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে ফ্রয়েডিয়ান ভাষায় বলা হয় ‘ডিফেন্স মেকানিজম’। এর অনেকগুলি ভাগ। তারাভিবির যেটি তাকে বলা হয় ‘Projection’ অর্থাৎ নিজের অদম্য ইচ্ছে গুলিকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে দোষারোপ করা—

‘This involves individuals attributing their own unacceptable thoughts, feeling and motives to another person’<sup>৬৩</sup>

তারাভিবির এই দ্বন্দ্বের কারণ লুকিয়ে আছে মূলত পুরুষ তাত্ত্বিক সমাজেই কারণ আমাদের সমাজে আজও পুরুষের পরকীয়া বা দুটি বিয়ে দোষের হয় না, দোষটা হয় মেয়েদের বেলাই। তাই রমজান বৃদ্ধ বয়সে (নিজের সাথের বাইরে বেরিয়েও!) তারাভিবিকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু তারাভিবিকে তার অদম্য ইচ্ছে পূরণের জন্য ব্যবহার করতে হয় ‘Projection’-এর চোরাপথ। ইলিয়াস কিন্তু নর-নারীর প্রেম কে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানে না বেঁধে স্বাধীনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা রাখতেন।

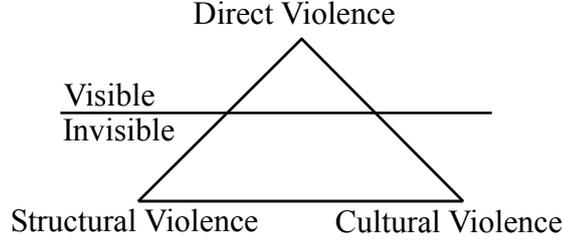
“একজন সভ্য নারী আর পুরুষের পরস্পরের প্রতি যদি অনুমোদন থাকে সেখানে তাদের মিলনে কোনো সংস্কার, অপরাধবোধ, পাপবোধ যেন বাধা হিসেবে না-আসে, সে-রকম সোসাইটি কোনোদিন আসবে কি না জানি না, কিন্তু যা আসবে না তাকে প্রত্যাশা করব না কেন?”<sup>৬৪</sup>

গল্পগ্রন্থ ‘দুখভাতে উৎপাত’ -এর (ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫) একটি খুব সুন্দর গল্প হল ‘মিলির হাতে স্টেনগান’। গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বপ্নভঙ্গের গল্প। বাংলাদেশের সাথে জড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১) রক্তদাগ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরের ইতিহাস আলাদা। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ইলিয়াস মনে করতেন যে—

“মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের দারুণ স্বপ্ন ছিল। ... এত স্বপ্ন দেখার তো কোনো মানে ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ তো তেমন organized কিছু ছিল না, তা ছাড়া এর definite কোনো goal ও ছিল না। সাধারণ মানুষ কৃষকেরা যে যুদ্ধ করেছিল তা তো কোনো আদর্শ থেকে করেনি। করেছে, কারণ না-করলে তারা মারা পড়ত। আর মুক্তিযুদ্ধের পরের সময়টা তো চরম স্বপ্নভঙ্গের কাল। ...Positive হলো মানুষের প্রতিরোধ করার সংকল্প, মানুষের সাহস।”<sup>৬৫</sup>

মিলি তবু আশা রাখে আব্বাস পাগলার উপর। তার পাগলামি শুরু মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে। আব্বাস পাগলা মনে করে দুশমনেরা এখন আকাশ, চাঁদ সব দখল করে নিচ্ছে, আব্বাস পাগলা তাদের আটকাতে পারে কিন্তু তার জন্য চাই স্টেনগান। তাই মিলি আব্বাস পাগলাকে অন্য সকল থেকে আলাদা করে চিনতে পারে। মিলির দাদা রানা একসময়ের মুক্তিযোদ্ধা, এখন অপরাধ মূলক কাজ করে, রাজনৈতিক নেতাদের সাহায্যে উঠতি বড়লোক। মিলির দাদার বন্ধুরাও তাই। মিলির মা তাদের মধ্যে কোনো পয়সাওয়ালা দাদার বন্ধুর সাথে মিলির বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু মিলি তাদের আলাদা করতে পারে না। সে তাদের মধ্যে আলাদা করতে পারে একমাত্র আব্বাস পাগলাকে। এই আব্বাস পাগলাই শেষে ভালো হয়ে যুদ্ধ ভুলে যায়। রানার কাছে আসে কাজের সাহায্য চাইতে। মিলির কাছে তখন আব্বাস পাগলাও সকলের সাথে ভিড়ে মিশে যায়। মুক্তিযুদ্ধে অনেক মেয়েরাও শহীদ হয়। মিলি আব্বাস পাগলার মাধ্যমে সেই লড়াইয়ের মধ্যে মিশে যেতে চায়, তাই তো সে শেষে দাদার স্টেনগান চুরি করে আব্বাস পাগলাকে দিতে চায়, কিন্তু আব্বাস পাগলা তখন সুস্থ আর বাংলাদেশের মত মিলিরও হয় স্বপ্নভঙ্গ কেননা আব্বাস পাগলাও সকলের সাথে ভিড়ে হারিয়ে যায়। ‘অহম্’ সর্বস্ব মানুষরা এভাবে মনুষ্যত্ব গিলে খায়। মিলি তবু স্বপ্ন দেখে কিন্তু মিলির পথে

থেকে যায় পারিবারিক বাঁধা। সেখান থেকেই সৃষ্টি হয় হিংসা কিংবা প্রতিরোধের। আমরা বাস্তবে এই হিংসার বা প্রতিরোধের সন্মুখ দিকটিই দেখি কিন্তু এর ভিতরে থাকে সংস্কার ও শৃঙ্খলের জোড়।



বর্তমান সময়ে বিত্তই করে মান বিচার। বিশেষণে হারিয়ে যায় বিশেষ্য। ‘মিলির হাতে স্টেনগান’ গল্পে আমরা দেখি মিলির মা’কে, তিনি গাড়িওয়ালা ছেলেটিকেই মিলির সাথে বেশি পছন্দ করেন বিয়ে দিতে, তিনি জানেন রানা সৎ পথে উপার্জন করছে না, তবু তার উপরই ভালোবাসা উগরে দিচ্ছেন। এমন আরো একটি চরিত্র দেখি ইলিয়াসের ‘কীটনাশকের কীর্তি’ গল্পে (গল্পগ্রন্থ ‘দোজখের ওম’, ১৯৮৯)। আমরা পাই রমিজ আলির বোন আসিমুল্লেসা কে। যে নিজেকে সাঁপে দেয় গ্রামের বিত্তশালী হাফিজুদ্দির ছেলে ‘ম্যাট্রিক পাসের’ কাছে। গল্পে কোথাও নেই বিশেষ্যের নাম। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে রমাপদ চৌধুরীর ‘রত্নকূট’ গল্পের কাঞ্চনের কথা, যে শেষ পর্যন্ত জয় করে লক্ষপতি মোহনলালকে। এই বিত্তশালীদের কাছে সাঁপে দেওয়া ছাড়া কি উপায় আছে কাঞ্চনদের, ও রমিজের বোনদের? রমিজের বোনের সেই সম্পর্কের উপরেই তো নির্ভর করত একদা পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। বলতে গেলে আয়, ভোগস্পৃহা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চায় সবাই আর সেই আর্থিক দুর্বলতায় অনেক কাঞ্চনরাই বাধ্য হয় নিজেদের সাঁপে দিতে বিত্তশালী মোহনলালদের কাছে।

ইলিয়াস এভাবে নারীর দোষ গুণ সব মিলিয়ে তুলে ধরেন, সেখানে বাদ যায় না কিছুই। যেমন—আমাদের মায়েরা অসুখকে একটু বাড়িয়ে বলতে ভালোবাসে। সেই রকম—ই একটি গল্প হল ‘অসুখ-বিসুখ’ গল্পটি। আতমন্লেসা সর্বদা অসুখ বিলাসি। নিজের মেয়ের অসুখকে সে হিংসা করে। সে চায় তার ঘরেও মেয়ের মত নানা রঙের বোতলে সাজানো ঔষধ থাকুক। তার জন্য সে সবাইকে তার শরীর খারাপের কথা বলে। গল্পের পরিনামটি কিন্তু কষ্টের গল্পের শেষে সত্যি আতমন্লেসা’র বড়ো রোগ হয়, ক্যান্সার, সে বোঝে কিন্তু সে

সুখী তার টেবিলে দামী ঔষধ সাজানো দেখে আর তাকে নিয়ে তার পরিবারের ব্যস্ততা দেখে।

‘দুধভাতে উৎপাত’ গল্পে আমরা দেখি ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে’ বাঙালি নারীর চিরন্তন মাতৃহের বাণীটিকে। জয়নাব হত দরিদ্র গ্রামের বৌ, সে এখন মৃত্যু পথযাত্রী তার একমাত্র ইচ্ছে তার সন্তানেরা যেন তার সামনে একটু দুধভাত খেতে পারে। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয় না। গরিবের দুধের আশা পূর্ণ হয় চালের গুড়ো দিয়ে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে অভাগী পারেনি তার মায়ের আশা পূর্ণ করতে তেমনি ’৪৭, ’৫২, ’৭১ পেরিয়ে যাওয়া বাংলাদেশে ওইদুলা’ও পারেনা তার মায়ের আশা পূর্ণ করতে। অগ্রস্থিত ইলিয়াসের এমনি একটি গল্প হল ‘ঈদ’ যেখানে রজবকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য নিজের মায়ের কাছে মার খেতে হয় কেননা রজব যাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে তারা মালিক পক্ষ, তার মা সে বাড়িতে কাজ করে। রজবের মা ফতিমার অসহায়ত্বের সঙ্গে মমতার দিকটি খুব নিখুঁত লেখনীতে তুলে ধরেন ইলিয়াস এই গল্পে।

ইলিয়াসের গ্রস্থিত একটি গল্প হল ‘প্রেমের গল্পো’ (গল্পগ্রন্থ ‘জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল’, জানুয়ারি ১৯৯৭) সেখানে নিজের স্ত্রী বুলা’র কাছে নিজের দর বাড়াতে জাহাঙ্গীরকে সাজাতে হয় তার মিথ্যে প্রেমের কিছু গল্প। সেই গল্পগুলিতে জাহাঙ্গীর সব নারীকে প্রত্যাখ্যাত করেছে। বুলা বোঝে, কেননা একই গল্প অন্যদিন বলবার সময় প্লটের পরিবর্তন করে। বিবাহিত জীবনের স্বামী-স্ত্রী’র মানসিক টানাপোড়েন, সেইসঙ্গে জাহাঙ্গীরের মানসিক একাকীত্বের মিথ্যে গল্প ফানুস সুন্দরভাবে তুলে ধরা আছে। চিরন্তন পুরুষত্ব নিজের স্ত্রীর কাছেও নিঃসঙ্গতার ঝাঁপি খুলবেনা তার বদলে তৈরি করবে মিথ্যে প্রেমের আষাঢ়ে গল্পো।

এভাবে ইলিয়াস সাহেব ভালোমন্দ সবমিলিয়ে তাঁর গল্প ভুবনে নারীদের তুলে ধরেন, তারা হয়ে ওঠে আমাদের চেনা জগতের রক্ত-মাংসে গড়া মানবী। যারা এই আবহমান কালে নিস্তন্ধে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

টুম্পারানীর একটুও নেই ভয়

একবার যা সত্য ভাবে তাইতে নিঃসংশয়।

টুম্পা যখন বড়ো হবে, রইবে না আর খুকী

নিজের সত্য অটল রাখতে নেবে অনেক ঝুঁকি।

সেনাপতির হাতে বাজুক অস্ত্রের ঝঙ্কার  
টুম্পারানীর চোখে মুখে ছাপ নেই শঙ্কার

রাজা রানী উজির নাজির দ্যাখাক প্রলোভন  
টুম্পা নেবে মুখ ফিরিয়ে, টলবে না তার মন  
টুম্পা রইবে অটল নিজের শক্তি ও বিশ্বাসে  
জনপ্রাণী থাকুক কিংবা নাইবা থাকুক পাশে।”<sup>৬৬</sup>

—আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গল্পের পরিসরে নতুন এই ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে করে উদ্ভাসিত। নিম্ন মধ্যবিত্তদের চরিত্রের কৌশল। ওপরে উঠার প্রবণতা, যোগ্যতাহীন হয়েও যোগ্যতম স্থান অধিকৃত করার কৌশল। এ এক চরম বিকারগ্রস্থ মনস্তত্ত্ব, যার জন্য বাড়াতে থাকে জীবন জটিলতা স্বার্থের প্রয়োজনে বাড়তে থাকে আবুল হালেম (প্রতিশোধ) এর মত লোকেদের সংখ্যা। “ফলে ব্যক্তি থেকে সমষ্টি প্রতিবাদ। ব্যক্তি ভোগে জীবন জটিলতায়। মধ্যবিত্তের গুণ আছে অনেক। সন্দেহ কি? কিন্তু পারস্পরিক সহনশীলতা সেই গুণগুলির একটি নয়। ধাওয়া করে, জব্দ করে, অন্যের বিপদ দেখলে সহানুভূতি জানানোর ছল করে ভেতরে ভেতরে খুশী হয়। হাৎপিণ্ডের ওপর চাপা পড়ে, অসুখ বাড়ে; কিন্তু মৈত্রী বাড়ে না। এর শিকড়-বাকড় অনেক গভীরে পৌঁতা।”<sup>৬৭</sup>

তথ্যসূত্র :

১. সিদ্দিকী আশরাফ : 'তিরিশ বসন্তের ফুল', ফারুক প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৭৫, পৃ. ৮৭।
২. ইকবাল শহীদ : 'কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৩।
৩. আজাদ আলাউদ্দিন আল : 'কবিতা সমগ্র-২', গতিধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. উৎসর্গ পত্র।
৪. ঘোষ বিনয় : 'মেট্রোপলিটন মন.মধ্যবিত্ত. বিদ্রোহ', ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ১৯৭৭, পৃ. ১৪।
৫. উমর বদরুদ্দিন : 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা', প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, জুন ১৯৮০, পৃ. ৮৮।
৬. ঘোষ বিনয় : 'মেট্রোপলিটন মন. মধ্যবিত্ত. বিদ্রোহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।
৭. রশিদ হারুন-অর : 'মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ', কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৪৫০।
৮. হায়দার দাউদ (সম্পাদিত) : 'বাংলাদেশের কবিতা', 'নেই', মোহাম্মদ রফিক, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৮৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ৭৫-৭৬।
৯. ইকবাল শহীদ : 'কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস',

- প্রাণ্ডপ্ত, পৃ. ১৪।
১০. চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত (সম্পাদিত) : ‘পরিকথা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা’, অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০০৬, পৃ. ৩০৯।
১১. মোহাম্মদ মোস্তফা : ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যে জীবন ও সমাজ’, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৩৮।
১২. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : ‘রচনা সমগ্র - ১’, ‘উৎসব’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৩।
১৩. প্রাণ্ডপ্ত : পৃ. ২৩।
১৪. প্রাণ্ডপ্ত : পৃ. ৩২।
১৫. সিদ্দিকী আশরাফ : ‘তিরিশ বসন্তের ফুল’, ‘ক্রিটিক’, প্রাণ্ডপ্ত, পৃ. ১০৫-১০৬।
১৬. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : ‘রচনা সমগ্র - ১’, ‘প্রতিশোধ’, প্রাণ্ডপ্ত, পৃ. ৪৬।
১৭. শাহদুজ্জামান : ‘জীবনের জঙ্গমতা : লেখকের উপনিবেশ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার’, ‘নিজভূমে পরবাসী’, রাডার ১৩ এপ্রিল ১৯৯২, পৃ. ১০৯।
১৮. মোহাম্মদ মোস্তফা : ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যে জীবন ও সমাজ’, প্রাণ্ডপ্ত, পৃ. ১৬১।
১৯. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : ‘রচনা সমগ্র - ১’, ‘পায়ের নিচে জল’, প্রাণ্ডপ্ত, পৃ. ১৯৮।
২০. প্রাণ্ডপ্ত : পৃ. ২১২।
২১. কাদরী শহীদ : ‘কবিতা’, ‘আলোকিত গণিকাবন্দ’, সাহিত্য

- প্রকাশ, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৬, পৃ. ৪৭।
২২. শরীফ আহমেদ : 'কালিক ভাবনা', মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম  
প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ৫৯।
২৩. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'রচনা সমগ্র - ১', 'যুগলবন্দি', প্রাগুক্ত,  
পৃ. ২৫৪।
২৪. চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত (সম্পাদিত) : 'পরিকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।
২৫. মোহাম্মদ মোস্তফা : 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যে  
জীবন ও সমাজ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।
২৬. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'রচনা সমগ্র', 'কান্না', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬।
২৭. চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত (সম্পাদিত) : 'পরিকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।
২৮. হাবীব আহসান : 'কবিতা সমগ্র', 'পৃথিবীর ইতিহাস', প্রাগুক্ত,  
পৃ. ৪৫৯-৬৩।
২৯. ইকবাল শহীদ : 'কথাশিল্পী-আখতারুজ্জামান ইলিয়াস',  
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৩০. শাহদুজ্জামান (সম্পাদিত) : 'জীবনের জঙ্গমতা, লেখকের উপনিবেশ',  
প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।
৩১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮৩।
৩২. হোসেন মোতহার : 'বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রশাসন', বাংলা  
একাডেমী ঢাকা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর  
১৯৯৮, পৃ. ৫৫।
৩৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৬।
৩৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৪।
৩৫. ইকবাল শহীদ : 'কথাশিল্পী-আখতারুজ্জামান ইলিয়াস',  
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৩৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৩।
৩৭. আহদুজ্জামান (সম্পাদিত) : 'কথাশিল্পী-আখতারুজ্জামান ইলিয়াস',

- প্রাণ্ডুক্ত, পৃ. ৬৮।
৩৮. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'রনা সমগ্র- ৩', 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু',  
মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে  
২০০৯, পৃ. ১৮।
৩৯. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'রচনা সমগ্র - ১', 'খোঁয়ারি', প্রাণ্ডুক্ত,  
পৃ. ১০৭।
৪০. মুখোপাধ্যায় সুভাষ : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'পদাদিক', 'অতঃপর', দে'জ  
পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশ জানুয়ারি  
২০০৮, পৃ. ২৩।
৪১. মোহাম্মদ মোস্তফা : 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যে  
জীবন ও সমাজ', প্রাণ্ডুক্ত, পৃ. ১৫৬।
৪২. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'রচনা সমগ্র - ১', 'মিলির হাতে স্টেনগান',  
প্রাণ্ডুক্ত, পৃ. ১৮২।
৪৩. ইকবাল শহীদ : 'কথাশিল্পী-আখতারুজ্জামান ইলিয়াস',  
প্রাণ্ডুক্ত, পৃ. ৫৮।
৪৪. প্রাণ্ডুক্ত : পৃ. ৫৮।
৪৫. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'রচনা সমগ্র - ১', 'অপঘাত', প্রাণ্ডুক্ত,  
পৃ. ২৮৯।
৪৬. হাবীব আহসান : 'কবিতা সমগ্র', 'দিনের সুর', প্রাণ্ডুক্ত,  
পৃ. ৪৯।
৪৭. মাহমুদ অনীক : 'আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা',  
বাংলা একাডেমী ঢাকা, ঢাকা, প্রকাশ  
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ৪।
৪৮. শাহদুজ্জামান (সম্পাদিত) : 'জীবনের জঙ্গমতা, লেখকের উপনিবেশ',  
প্রাণ্ডুক্ত, পৃ. ৮০।
৪৯. রহমান মোঃ মুস্তাফিজুর : 'বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের

- রূপায়ণ', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ঢাকা, প্রথম  
প্রকাশ, জুন ২০০৯, পৃ. ১৮৫।
৫০. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'রচনা সমগ্র - ১', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', প্রাগুক্ত,  
পৃ. ৬১।
৫১. শাহদুজ্জামান (সম্পাদিত) : 'জীবনের জঙ্গমতা, লেখকের উপনিবেশ',  
প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
৫২. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'রচনা সমগ্র - ১', 'ফেরারী', প্রাগুক্ত,  
পৃ. ৬৩।
৫৩. মিত্র দীনবন্ধু : 'সধবার একাদশী', শিলালিপি, কলকাতা,  
নভেম্বর, ২০০৮, পৃ. ১২১।
৫৪. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'রচনা সমগ্র - ১', 'যুগলবন্দি', প্রাগুক্ত,  
পৃ. ১৬৬।
৫৫. ইকবাল শহীদ : 'কথাশিল্পী-আখতারুজ্জামান ইলিয়াস',  
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।
৫৬. সেনগুপ্ত মল্লিকা : 'নান্দীমুখ' (কথামানবী), মূলগ্রন্থ - 'মল্লিকা  
সেনগুপ্ত কবিতা সমগ্র', সম্পাদনা - সুবোধ  
সরকার, আনন্দ, কোলকাতা, জুন, ২০১৩,  
পৃ. ২০৫।
৫৭. মুখোপাধ্যায় কনক : 'মার্কসবাদ ও নারিমুক্তি', মূলগ্রন্থ - 'নারী  
নির্যাতন নারী আন্দোলন', ড. চিত্ত মণ্ডল  
সম্পাদিত, নবজাতক প্রকাশক, কলকাতা,  
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, পৃ. ১৭৬-১৭৮।
৫৮. মৈত্র শেফালী : 'নৈতিকতা ও নারীবাদ', নিউ এজ,  
কলকাতা, জুন, ২০০৭, পৃ. ২১-২২।
৫৯. জাহান সেরিনা : 'মেয়েলি শরীর : শরীরী মেয়ে', মূলগ্রন্থ -  
'লৌকিক উদ্যান মানবী সংখ্যা', দশম বর্ষ

পূর্তি সংখ্যা, ১৯৮৯-১৯৯৯, সম্পাদক -  
প্রমেন্দ্র মজুমদার, ইউ বি আই স্টাফ  
ওয়েলফেয়ার এণ্ড কালচারাল সোসাইটি  
কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪০৬,  
আগস্ট, ১৯৯৯, পৃ. ৩৩।

৬০. ঐ, : পৃ. ২৩।
৬১. শাহাদুজ্জামান : 'জীবনের জঙ্গমতা ও লেখকের উপনিবেশ  
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস' (সাক্ষাৎকার),  
পৃ. ৩৭। (বইটি প্রতিলিপি রূপে আমার কাছে  
সংরক্ষিত তাই পুরো তথ্য দেওয়া গেল  
না)।
৬২. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'যোগাযোগ', মূলগ্রন্থ - 'রচনাসমগ্র - ১  
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।
৬৩. শাহাদুজ্জামান : 'জীবনের জঙ্গমতা ও লেখকের উপনিবেশ',  
প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।
৬৪. Internet Search '[www.simplypsychology.org](http://www.simplypsychology.org)'।
৬৫. শাহাদুজ্জামান : 'জীবনের জঙ্গমতা ও লেখকের উপনিবেশ',  
প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।
৬৬. ঐ, : পৃ. ৭৪।
৬৭. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'টুম্পারানী', মূলগ্রন্থ - 'রচনাসমগ্র - ৪  
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস', মাওলা ব্রাদার্স,  
ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ২০৪।